পথ চলার বাতি

লেখকঃ

আবু আবদিল্লাহ ইমাম জাফর ইবনে মুহাম্মদ আস- সাদিক্ব

(সালামুল্লাহি আলাইহি)

ইংরেজী অনুবাদঃ

ফাদলাল্লাহ হায়রি

অনুবাদঃ

মুহাম্মদ ইরফানুল হক

সম্পাদনাঃ

এ.কে.এম. রশিদুজ্জামান

ওয়াইজম্যান পাবলিকেশনস

শিরোনামঃ পথ চলার বাতি

লেখকঃ আবু আবদিল্লাহ ইমাম জাফর ইবনে মুহাম্মদ আস- সাদিক্ব

(সালামুল্লাহি আলাইহি)

অনুবাদঃ মুহাম্মদ ইরফানুল হক

সম্পাদনাঃ এ.কে.এম. রশিদুজ্জামান

প্রকাশকঃ ওয়াইজম্যান পাবলিকেশনস

কলোড়া, গোবরা বাজার, নড়াইল।

গ্রন্থস্বতঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত ।

প্রকাশকালঃ ১৫ই রমজান, ১৪৩০ হি., ২২শে ভাদ্র, ১৪১৬ বাং., ৬ই সেপ্টেম্বর, ১০০৯ খ্রী.।

মূদ্রণঃ মাল্টি লিংক

১৪৫/সি, হাজী খালেদ মার্কেট, ফকিরাপুল, ঢাকা- ১০০০।

প্রচ্ছদ ও কম্পোজঃ আলতাফ হোসাইন ।

উৎসর্গ

যুগের নিষ্পাপ ইমাম মাহদী (আ.) এর সম্মানিত সকল সাহায্যকারীদের উদ্দেশ্যে

লেখক পরিচিতি

আবু আবদিল্লাহ ইমাম জাফর ইবনে মুহাম্মদ আস- সাদিক্ব (সালামুল্লাহি আলাইহি) মহানবীর (সা.) পবিত্র বংশের ষষ্ঠতম ইমাম হিসেবে সুপরিচিত । তিনি ৮৩ হিজরীর ১৭ই রবিউল আউয়াল মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন । তার পিতা ছিলেন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল- বাক্বির (সালামুল্লাহি আলাইহি) ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (সালামুল্লাহি আলাইহি) ছিলেন মহানবী (সা.) এর ওয়াসী ই উত্তরসূরীদের একজন ।

আল্লামা শেখ সুলাইমান কুনদুযী তার কিতাব 'ইয়া নাবিউল মুওয়াদ্দা'- র ৪৯৪ পৃষ্ঠায় আবু বসির থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বর্ণনা করেছেন জাবির ইবনে ইয়াযীদ জুআফী থেকে যে- আমি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারীকে বলতে শুনেছি যে- রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলেছেনঃ

"হে জাবির, আমার ওয়াসীগণ এবং আমার পরে মুসলমানদের ইমামরা হচ্ছে আলী, হাসান হোসেইন, আলী ইবনে হোসাইন, মুহাম্মাদ ইবনে আলী- বাক্বীর নাম বিখ্যাত । হে জাবিরতুমি তার সাক্ষাত পাবে এবং যখন পাবে আমার সালাম তার কাছে পৌছে দিও । বাক্বীর- এর পর আসবে জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, মূসা ইবনে জাফর, আলী ইবনে মূসা, মুহাম্মাদ ইবনে আলী, আলী ইবনে মুহাম্মাদ, হাসান ইবনে আলী এবং আল ক্বায়েম যার নাম ও ডাক নাম আমার নাম ও ডাক নামের অনুরূপ । 'ক্বায়েম' হাসান ইবনে আলীর সন্তান । মাহদী হল সেই ব্যক্তি যা পূর্ব ও পশ্চিমের উপর বিজয় লাভ করবে । মাহদী হল সেই ব্যক্তি যে তার সাথীদের দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করবে । কোন ব্যক্তি তার ইমামতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে না শুধু তারা ছাড়া যাদের হৃদয়ের বিশ্বাসকে আল্লাহ পরীক্ষা করে নিয়েছেন ।"

উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (সালামুল্লাহি আলাইহি) ছিলেন মহানবী (সা.) এর ১২ জন ওয়াসীদের একজন । তিনি ছিলেন সে সময়ের অত্যন্ত পরহেজগার, প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানী, আধ্যাত্মিক শিক্ষক এবং শ্রেষ্ঠ পথ নির্দেশক । তার মত ইবাদাত, জিকির এবং খোদাভীরুতায় ভারসাম্যপূর্ণ ও উত্তম এখলাস সম্পন্ন আর কাউকে পাওয়া যায় না । তার সময়ে হাদীস সংরক্ষণ, ইসলামী দর্শন, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উচ্চতর গবেষণা স্ব স্ব

ক্ষেত্রে শীর্ষে পৌছে যায় । তার সরাসরি তত্ত্বাবধানে জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা রসায়ন, গণিত, ধর্মতত্ত্ব, আধ্যাত্মিক জ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক ছাত্র শিক্ষালাভ করে ।আল্লামা শেখ তুসি তার 'রিজাল' গ্রন্থে ৩১৯৭ জন পুরুষ ও ১২ জন মহিলার জীবনী বর্ণনা করেছেন যারা ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (সালামুল্লাহি আলাইহি)- এর কাছে শিক্ষা অর্জন করেছেন এবং তার উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন । আল্লামা শেখ মুফিদ তার 'কিতাব আল- ইরশাদ' গ্রন্থে এ সংখ্যা চার হাজারেরও বেশী বলে উল্লেখ করেছেন । সুবিখ্যাত কয়েকজনের মধ্যে হুমরান বিন আয়ান সাইবানি, আব্দুল্লাহ বিন আবি ইয়াফুর, মুফাযযাল বিন ওমর জায়াফি, আবান বিন তাগলুব আল- কাবারি, বারিদ আল- আযালি, আবু হামজা আল- সুমালি (সাবিত বিন দিনার), হাম্মাদ বিন উসমান, যারারা বিন আইয়ুন প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে যারা জ্ঞান, প্রজ্ঞা, হাদীস সংরক্ষণ ও ইসরাম প্রচারে ব্যপক ভূমিকা রাখেন । এছাড়াও বিখ্যাত রসায়নবিদ জাবির ইবনে হাইয়্যান এবং কালাম শাস্ত্রবিদ ও তার্কিক হিশাম ইবনে হাকাম কিন্দিও তারছত্রদের অন্যতম । হযরত আবু হানিফা (হানাফি চিন্তা দর্শনের প্রবর্তক), হযরত মালিক ইবনে আনাস (মালিকি চিন্তা- দর্শনের প্রবর্তক) ও সুফিয়ান বিন সাইদ আল সাওরী তার ছাত্র ছিলেন । ইবনে হাজার হাইসামী ও আল্লামা শিবলাঞ্জি তাদের গ্রন্থে ইমাম জাফর সাদিক্ব (সালামুল্লাহি আলাইহি) এর শিক্ষাকেন্দ্রর প্রসংশা করেছেন এবং সেখানে হযরত আবু হানিফার ছাত্র হওয়ার বিষয়টি বিশেষভাবি উল্লেখ করেছেন ।

তিনি বিপুল সংখ্যক হাদীস মহানবী (সা.) থেকে তারই বংশের ধারাবাহিকতায় বর্ণনা করেছেন যা হাদীস গ্রন্থসমূহে ব্যাপকভাবে উল্লেখিত হয়েছে । বিখ্যাত হাদীসবিদদের অধিকাংশই তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন । 'পথ চলার বাতি' (মিসবাহুশ শারিয়াহ) গ্রন্থটি তার পথ নির্দেশনামূলক অনেকগুলো মূল্যবান কাজের একটি । এখানে তিনি জ্ঞান, আমল, আত্মসংশোধন, খোদা পরিচিতি, খোদা ভীতি, খোদা প্রেম, আধ্যাত্মিক উন্নয়ন, পারিবারিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার ইত্যাদি বিষয়ে ব্যক্তির করনীয়গ্রলো সম্পর্কে অত্যন্ত স্টষ্টভাবে ইসলামী দিক নির্দেশনা দিয়েছেন ।

তিনি ছিলেন নবী বংশের অন্যান্য ইমামদের মতই অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে স্পষ্টবাদী । অত্যাচারী শাসক যদি তাকে তরবারির আঘাতে বা ফাসির মাধ্যমে হত্যা করতো্ তাহলে মহানবী (সা.) পবিত্র বংশধরকে হত্যার কারণে জনগণের শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার আশংকা ছিল । তাই আব্বাসীয় খলিফা মানসুর দাওয়ানকী তাকে বিষপানে হত্যা করে জনগণের মাঝে প্রচার করে যে, তিনি অসুস্থ্ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন । তার পিতাকেও একইভাবে হত্যা করা হয়েছিল । ইমাম জাফর আস- সাদিক্ব (সালামুল্লাহি আলাইহি) ১৪৮ হিজরীর ২৫শে শাওয়াল শাহাদাত বরণ করেন । তাকে মদীনায় জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয় ।

- সম্পাদক

পরিচ্ছেদ- ১

দাসত্ব (উবুদিয়্যাহ)

আচরণের মূলে চারটি ভাগ রয়েছেঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে আচরণ, নিজের সাথে আচরণ, সৃষ্টির সাথে (যেমন, জনগণ) আচরণ এবং এই পৃথিবীর সাথে আচরণ। এর প্রত্যেকটি আবার সাতটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, ঠিক যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে আচরণের সাতটি নীতি রয়েছেঃ তাঁকে তাঁর প্রাপ্য দেয়া, তাঁর (আদেশ নিষেধের) সীমানা রক্ষা করা, তাঁর নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ থাকা, তাঁর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর পরীক্ষায় ধৈর্যশীল হওয়া, তাঁর পবিত্রতার তাসবীহ করা এবং তাঁকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা।

নিজের সাথে আচরণের সাতটি নীতি হচ্ছেঃ ভয়, সংগ্রাম, ক্ষতি সহ্য করা, আধ্যাত্মিক শৃংখলা, সত্যবাদীতা ও ইখলাস (আন্তরিকতা) সন্ধান করা, নফস যা ভালোবাসে তা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা এবং একে দারিদ্রের (ফাকর) সাথে বেঁধে ফেলা।

সৃষ্টির সাথে আচরণের সাতটি নীতি হলোঃ ক্ষমাশীলতা, বিনয়, উদারতা, দয়ামায়া, সৎ উপদেশ, ন্যায়বিচার ও সাম্যতা।

এ পৃথিবীর সাথে আচরণের সাতটি নীতি হচ্ছেঃ হাতে যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা, যা নেই তার চাইতে যা আছে তাকে অগ্রাধিকার দেয়া, যা ধরা দেয় না তা পাওয়ার প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করা, অতিরিক্ত প্রাচুর্য ঘৃণা করা, অল্পতে তুষ্টি বেছে নেয়া, এ পৃথিবীর খারাপকে জানা এবং তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে পরিত্যাগ করা এবং এর আধিপত্যকে অগ্রাহ্য করা।

যখন এই সবগুলো গুণাবলী কোন ব্যক্তির মাঝে পাওয়া যায় তাহলে সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উচ্চস্থানীয় ও তাঁর ঘনিষ্ট দাস এবং বন্ধুদের (আউলিয়া) একজন।

দাসত্বের বিষয়ে আরো কিছু কথা

দাসত্ব হলো সারবস্তু, যার অর্ন্তনিহিত প্রকৃতি হচ্ছে প্রভুত্ব (রুবুবিয়াহ)। দাসত্বে যা অনুপস্থিত তা প্রভুত্বে পাওয়া যায় এবং যা প্রভুত্ব থেকে পর্দার আড়ালে থাকে তা দাসত্বে পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)

‘‘আমরা শীঘ্রই তাদেরকে দেখাবো আমাদের নিদর্শনগুলো দিগন্তে এবং তাদের সত্তার ভিতরে । ঐক্ষণ পর্যন্ত যখন তাদের কাছে তা পরিস্কার হয়ে যাবে যে তা সত্য। তোমার রবের বিষয়ে এটি কি যথেষ্ট নয় যে তিনি সব কিছুর উপরে সাক্ষী?’’ (সূরা হা- মীম আস- সাজদাহঃ ৫৩)

এর অর্থ তিনি অস্তিত্ববান তোমার অনুপস্থিতিতে এবং তোমার উপস্থিতিতেও। দাসত্ব অর্থ নিজেকে সবকিছু থেকে মুক্ত করে ফেলা এবং তা অর্জনের পথ হচ্ছে নিজের সত্তা যা পেতে চায় তা তাকে দিতে অস্বীকার করা এবং তা যা অপছন্দ করে তা তাকে বহন করতে বাধ্য করা। এর চাবি হচ্ছে বিশ্রাম পরিত্যাগ করা। একাকীত্বকে ভালোবাসা এবং ‘‘আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে প্রয়োজন’’ এই স্বীকৃতির পথকে অনুসরণ করা।

পবিত্র নবী (তাঁর ও তার পরিবারের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলেছেনঃ ‘‘আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ইবাদাত করো যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো। এমনকি যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তিনি তোমাকে দেখছেন।’’

عبد (আব্দ বা দাস) শব্দটিতে তিনটি অক্ষর আছেঃ ع, ب, ও د । ع হচ্ছে علم (ইলম) বা আল্লাহ সম্পর্কে একজনের জ্ঞান এবং ب হচ্ছে بون যার অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু থেকে কোন ব্যক্তির দূরত্ব এবং د হচ্ছে دنو (দুনু) বা আল্লাহর সাথে ব্যক্তির নৈকট্য, কোন গুণাবলী ও পর্দার বাঁধা ছাড়া।

আচরণের মূলনীতি চারটি, যেভাবে আমরা এ অধ্যায়ের শুরুতে বলেছি।

দৃষ্টি নামিয়ে রাখার বিষয়ে

ব্যক্তি তার দৃষ্টিকে নামিয়ে রাখবে- এর চেয়ে লাভজনক আর কিছু নেই, কারণ দৃষ্টি সে বিষয়ের উপর থেকে নিজেকে নামিয়ে রাখেনা যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হারাম করেছেন, যদি না ইতিমধ্যেই (আল্লাহর) মর্যাদা ও গৌরব 'প্রত্যক্ষ করা' তার অন্তরে উপস্থিত হয়েছে। বিশ্বাসীদের আমীরকে (ইমাম আলী- আ.) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলোঃ কী দৃষ্টিকে নামিয়ে রাখতে সাহায্য করে? তিনি বলেছিলেনঃ ''তাঁর শক্তির কাছে আত্মসমর্পন করা যিনি তোমার গোপন বিষয় জানেন। চোখ হচ্ছে অন্তরের গুপ্তচর এবং বুদ্ধির দূত; তাই তোমার দৃষ্টিকে তা থেকে নামিয়ে রাখো যা তোমার বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, যা তোমার অন্তর অপছন্দ করে এবং যা তোমার বুদ্ধির কাছে ঘৃন্য মনে হয়।''

পবিত্র নবী (তাঁর ও তাঁর পরিবারের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলেছেনঃ ''তোমাদের চোখকে নামিয়ে রাখো- তোমরা বিস্ময়কর জিনিস দেখবে।''

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ)

''বিশ্বাসীদের বলো যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে নামিয়ে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাযত করে।'' (সূরা নূরঃ ৩০)

ঈসা (আ.) তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেনঃ ''নিষিদ্ধ জিনিসের দিকে তাকানো থেকে সতর্ক হও, কারণ তা আকাঙ্ক্ষার বীজ এবং তা পথভ্রষ্ট আচরণের দিকে নিয়ে যায়।''

ইয়াহইয়া (আ.) বলেছেনঃ ''আমি অপ্রয়োজনীয় দৃষ্টিপাতের চাইতে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করি।''

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এক ব্যক্তিকে বলেছিলেন যে এক অসুস্থ মহিলাকে দেখতে গিয়েছিলোঃ ''অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার চাইতে তোমার চোখ দু'টো হারানো উচিত ছিলো।''

যখনই চোখ কোন নিষিদ্ধ জিনিসের দিকে তাকায়, আকাঙ্ক্ষার একটি গিট সে ব্যক্তির অন্তরে বেঁধে যায় এবং সেই গিট খুলবে শুধু দুই শর্তেঃ হয় প্রকৃত তওবায় সে দুঃখে কাঁদবে অথবা যে দিকে সে তাকিয়েছিলো এবং যার আকাঙ্ক্ষা করেছিলো তার দখল নিবে। আর যদি কোন ব্যক্তি তার দখল নেয় অন্যায়ভাবে, তওবা ছাড়া, তাহলে তা তাকে আগুনে (জাহান্নামে) নিয়ে যাবে।

আর যে ব্যক্তি দুঃখ ও অনুতাপের সাথে তওবা করে, তার বাসস্থান হচ্ছে জান্নাতে এবং তার গন্তব্য হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অনুগ্রহ।

হাঁটার বিষয়ে

যদি তুমি বুদ্ধিমান হয়ে থাকো তাহলে যে কোন স্থান থেকে রওনা দেয়ার আগে তোমার উচিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া এবং সৎ নিয়ত রাখা, কারণ সত্তার প্রকৃতি হচ্ছে সীমালংঘন করা এবং নিষিদ্ধ জিনিসে অবৈধ হাত প্রসারিত করা। যখন তুমি হাঁটো তখন তোমার উচিত গভীরভাবে ভাবা এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বিস্ময়কর কাজগুলো লক্ষ্য করা- যেখানেই তুমি যাও। টিটকারী করো না অথবা দম্ভভরে হেঁটো না যখন হাঁটো; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا)

''গর্বভরে যমীনে হাঁটাচলা করো না ।'' (সূরা লোকমানঃ ১৮)

তোমার চোখ নামিয়ে রাখো তা থেকে যা তোমার বিশ্বাসের প্রতি সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে বার বার স্বরণ করো। একটি হাদীস রয়েছে যে, যেসব স্থানে এবং যার সাথে আল্লাহর স্মরণ- এর সম্পর্ক আছে সেগুলো বিচার দিনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সামনে সাক্ষ্য দিবে এবং সেসব মানুষের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাইবে যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেন।

পথ চলার সময় লোকজনের সাথে অতিরিক্ত কথা বলো না, কারণ তা বাজে আচরণ। বেশীরভাগ রাস্তা হচ্ছে শয়তানের ফাঁদ ও বাজার , তাই তার ধোঁকা থেকে নিজেকে নিরাপদ ভেবো না। তোমার আসা ও যাওয়াকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আনুগত্য বানাও – তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সংগ্রাম করে, কারণ তোমার সব চলাফেরা বইতে লিপিবদ্ধ হবে। যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)

‘‘সেদিন তাদের জিহবা এবং তাদের হাতগুলো ও পাগুলো সাক্ষী দিবে তাদের বিরুদ্ধে- তারা যা করেছিলো সে সম্পর্কে।’’ (সূরা নূরঃ ২৪)

(وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ)

‘‘আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্মকে তার ঘাড়ে ঝুলিয়ে দেই।’’ (সূরা বনী ইসরাইলঃ ১৩)

পরিচ্ছেদ- ২

জ্ঞানের বিষয়ে

জ্ঞান হচ্ছে প্রত্যেক উন্নত আধ্যাত্মিক অবস্থার ভিত্তি এবং প্রত্যেক উচুঁ মাকামের পূর্ণতা। এ কারণে পবিত্র রাসূল (সা.) বলেছেনঃ ''প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর জন্য জ্ঞান সন্ধান করা বাধ্যতামূলক- তাহলো তাক্বওয়া (সতর্কতা) অবলম্বনের জন্য জ্ঞান এবং ইয়াক্বিন (নিশ্চিত জ্ঞান)। ইমাম আলী (আ.) বলেছেনঃ ''জ্ঞান সন্ধান কর যদি তা চীনেও হয়।'' অর্থাৎ নিজের সত্তা সম্পর্কে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, এর ভিতরেই লুকায়িত আছে মহান প্রভু সম্পর্কে জ্ঞান। পবিত্র রাসূল (সা.) বলেছেনঃ ''যে ব্যক্তি তার নিজ সম্পর্কে জানে সে তার রবকে জানে, '' এছাড়া তোমাদের উচিত সে জ্ঞান অর্জন করা যা ছাড়া কোন কাজই সঠিক নয় এবং তা হচ্ছে (ইখলাস) আন্তরিকতা। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে আশ্রয় নেই সেই জ্ঞান থেকে যার কোন উপকারিতা নেই- তাহলো সেই জ্ঞান যা ইখলাসের সাথে কৃত কাজের পরিপন্থী।

জেনে রাখো সামান্য পরিমাণ জ্ঞানের জন্য বিরাট পরিমাণ কাজ দরকার, কারণ ক্বিয়ামত সম্পর্কে জ্ঞানের জন্য- যে ব্যক্তির এ জ্ঞান রয়েছে- তার সারা জীবন সে অনুযায়ী কাজ করে যেতে হয়। ঈসা (আ.) বলেছেনঃ ''আমি একটি পাথর দেখলাম যাতে লিখা ছিলো 'আমাকে উল্টিয়ে দাও' তাই আমি তা উল্টে দিলাম। অন্য পিঠে লিখা ছিলোঃ 'যে ব্যক্তি- সে যা জানে তা অনুযায়ী কাজ করে না, সে ধ্বংস হয়ে যাবে- সে যা জানে না তা খুজঁতে গিয়ে এবং তার নিজের জ্ঞান তার বিরুদ্ধে যাবে।''

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা দাউদ (আ.)- কে সংবাদ পাঠালেনঃ ''যে ব্যক্তির জ্ঞান আছে কিন্তু সে তার জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করে না তার সাথে আমি নূন্যতম আচরণ যা করবো তা সত্তরটি বাতেনী শাস্তির চেয়েও খারাপ, তাহলো তার অন্তর থেকে আমার স্মরণের মিষ্টতা দূর করে দিবো।'' জ্ঞানের মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দিকে কোন পথ নেই এবং জ্ঞান

হচ্ছে একজন মানুষের সাজপোষাক- এই পৃথিবীতে ও আখেরাতে, বেহেশতের দিকে তার চালক এবং এর মাধ্যমে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে।

সেই সত্যিকারভাবে জানে- যার ভেতরে পরিশুদ্ধ আচরণ, বিশুদ্ধ দোয়া, সত্যবাদিতা এবং তাকওয়া (সতর্কতা) কথা বলে; তার জিহবা, তার বিতর্ক, তার তুলনা এবং দাবীগুলো নয়। এছাড়া, অন্য সময়ে যারা জ্ঞান সন্ধান করেছে তাদের ছিলো বুদ্ধি, ধার্মিকতা, প্রজ্ঞা, বিনয়, তাকওয়া ও সতর্কতা, কিন্তু আজকাল আমরা দেখি যারা তা সন্ধান করে তাদের মধ্যে এ ধরনের কোন গুণাবলী নেই। জ্ঞানী ব্যক্তির প্রয়োজন বুদ্ধি, দয়া মায়া, সৎ উপদেশ, সহ্যশক্তি, ধৈর্য, সন্তুষ্টি এবং উদারতা। যে জানতে চায় তার প্রয়োজন জ্ঞানের জন্য আকাঙ্ক্ষা, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, আত্মনিয়োগ (তাঁর সময় ও কর্মশক্তি), ধার্মিকতা, তাকওয়া (সতর্কতা), স্মরণশক্তি এবং দৃঢ়তা।

বিচারিক রায় দেয়া

বিচারিক রায় দেয়া তার জন্য অনুমোদিত নয় যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বাতেনী পবিত্রতা, তার গোপন ও প্রকাশ্য কাজে ইখলাস ও প্রত্যেক হালে (অবস্থায়) একটি প্রমাণ দান করেন নি। তা এ কারণে- যে ব্যক্তি বিচারিক রায় দিলো সে আইনগত সিদ্ধান্ত দিলো এবং আইনগত সিদ্ধান্ত শুধু তখনই সিদ্ধ যখন তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অনুমতিতে এবং তাঁর প্রমাণের মাধ্যমে হয়। যে তার বিচারিক রায়তে যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াই উদার, সে অজ্ঞ মূর্খ এবং তাকে তার মূর্খতার জন্য শাস্তি দেয়া হবে এবং তার বিচারিক রায় তার জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে- যেভাবে হাদীসে এর ইঙ্গিত রয়েছে। জ্ঞান হচ্ছে একটি আলো (নূর) যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যাকে তাঁর ইচ্ছা তার হৃদয়ে দান করেন।

পবিত্র রাসূল (সা.) বলেছেনঃ ''যে তোমাদের মধ্যে বিচারিক রায় দেয়ার বিষয়ে সবচেয়ে দুঃসাহসী সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি সবচেয়ে বেআদব।'' বিচারক কি জানে না যে সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ও তাঁর দাসদের মাঝে হস্তক্ষেপ করেছে এবং সে জান্নাত ও

আগুনের মাঝে দুলছে? সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনাহ বলেছিলোঃ ‘‘কীভাবে অন্য কেউ আমার জ্ঞান থেকে লাভবান হতে পারে যদি আমি নিজেকে তার উপকারিতা থেকে বঞ্চিত রাখি?’’ কোন ব্যক্তির জন্য সঠিক নয় যে সে সৃষ্টির মধ্যে হালাল ও হারাম সম্পর্কে বিচারিক রায় দিবে, শুধু সেই ব্যক্তি ছাড়া যে তার সময়ের জনগণকে, তার গ্রাম, তার শহরকে রাসূল (সা.)- এর আনুগত্যের মাধ্যমে সত্যের অনুসারী করে এবং যে জানে তার বিচারিক রায়ের কোন বিষয়টি প্রয়োগযোগ্য। রাসূল (সা.) বলেছেনঃ ‘‘বিচারিক রায় দেয়া এমন বিরাট একটি বিষয় যে সেখানে, ‘আশা করা যায়’, ‘সম্ভবত’ এবং ‘হয়তোবা’- র কোন স্থান নেই।

বিশ্বাসীদের আমির (আলী- আ.) একজন বিচারককে বলেছিলেনঃ ‘‘তুমি কি কোরআনের কোন্ আয়াত ‘রহিতকারী’ এবং কোন্ আয়াত ‘রহিত হয়েছে’ তার মধ্যে পার্থক্য জানো?’’

- ‘না’

- ‘‘কোরআনের উদাহরণগুলোর মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তোমার ভালো দখল আছে?’’

- ‘না’

- ‘‘তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে গেছো এবং অন্যদের ধ্বংস করেছো’’।

একজন বিচারকের জন্য জানা প্রয়োজন কোরআনের বিভিন্ন অর্থ, রাসূল (সা.)- এর পথের সত্য, বাতেনী ইঙ্গিত, ভদ্রতা, ঐক্যমত ও ভিন্নমত এবং তারা যে বিষয়ে একমত ও ভিন্নমত সে সম্পর্কে পরিচিত থাকা। এরপর তার থাকা উচিত সূক্ষ পার্থক্য বুঝার ক্ষমতা, শুদ্ধ আচরণ, প্রজ্ঞা এবং সতর্কতা। যদি তার এগুলো থাকে, তাহলে তাকে বিচার করতে দাও।

ভালোর আদেশ করা ও খারাপকে নিষেধ করা

যে ব্যক্তি তার দুঃচিন্তা ছুঁড়ে ফেলে নি, তার নিজের সত্তার খারাপ ও তার ক্ষুধা থেকে পবিত্র হয় নি, শয়তানকে পরাজিত করে নি এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বেলায়েতের অধীনে এবং তাঁর নিরাপত্তার ভেতর প্রবেশ করে নি সে যথাযথভাবে ভালোর আদেশ এবং খারাপকে যথাযথভাবে নিষেধ করতে অক্ষম এবং যেহেতু সে উল্লেখিত গুণাবলী অর্জন করতে পারে নি, সে ভালোর আদেশ ও খারাপকে নিষেধ করার জন্য যে পদক্ষেপই গ্রহণ করুক তা তার বিরুদ্ধেই যাবে এবং জনগণ তা থেকে কোন উপকার লাভ করবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ)

''কী? তোমরা কি জনগণকে ভালো হওয়ার আদেশ দাও এবং নিজেদের সত্তাকে অবহেলা কর অথচ তোমরা কোরআন পড়ছো, তোমরা কি বুঝ না?'' (সূরা বাকারাঃ ৪৪)

যে তা করে তাকে ডেকে বলা হয়ঃ ''হে বিশ্বাসঘাতক, তুমি কি আমার সৃষ্টি থেকে তা দাবী কর যা তুমি নিজে প্রত্যাখ্যান করেছো এবং নিজের উপর লাগামকে (এই বিষয়ে) ঢিল দিয়েছো?''

বর্ণিত আছে যে আলাবা আল আসাদি রাসূলুল্লাহকে (সা.) এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেঃ

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ)

''হে যারা বিশ্বাস কর, নিজেদের সত্তার যত্ন নাও; যে ভুল করে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না যখন তোমরা সঠিক পথে আছো।'' (সূরা মায়িদাঃ ১০৫)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ''ভালোর আদেশ দাও এবং খারাপকে নিষেধ করো এবং যে ক্ষতি তোমাদের স্পর্শ করে তা সহ্য কর, ঐ সময় পর্যন্ত যখন তোমরা দেখতে পাও নীচতাকে মেনে চলা হচ্ছে, আবেগকে অনুসরণ করা হচ্ছে এবং যখন প্রত্যেকেই তার নিজের মতামতকে বড় করে দেখবে, তখন তোমরা শুধু নিজেদের বিষয়ে মনোযোগ দাও এবং সাধারণ জনগণের বিষয়গুলো উপেক্ষা করে যাও।''

যে ব্যক্তি ভালোর আদেশ দেয় তার জানা দরকার কী অনুমোদিত এবং কী নিষিদ্ধ; অবশ্যই সে যেন সে বিষয়ে নিজের পছন্দ-অপছন্দ থেকে মুক্ত থাকে যখন সে ভালোর আদেশ দেয়, জনগনকে ভালো উপদেশ দেয়, যেন তাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু হয় এবং তাদের নরমভাবে ও পরিষ্কারভাবে আহবান করে এবং সেইসাথে তাদের বিভিন্ন চরিত্র সম্পর্কেও খেয়াল রাখে, যেন সে প্রত্যেককে তার যথাযথ স্থানে রাখতে পারে।

তাকে অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে নফসের চালাকি এবং শয়তানের ফাঁদ-এর দিকে। তাকে অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হবে যদি কোন বিপদ আপদ আসে এবং যে বিষয়ে সে তাদেরকে উপদেশ দেয় সে বিষয়ে অবশ্যই সে জনগণের কাছ থেকে তার কোন প্রতিদান নিবে না, না তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে। সে অবশ্যই আক্রমণাত্মক ও আবেগপূর্ণ হবে না। সে নিজের জন্য রাগান্বিত হবে না। সে অবশ্যই নিজের নিয়তকে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য স্থির করবে এবং তাঁর সাহায্য চাইবে এবং তাকেই চাইবে। কিন্তু যদি জনগণ তার বিরোধিতা করে এবং তার প্রতি কর্কশ আচরণ করে তাহলে তাকে অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হবে এবং যদি তারা তার সাথে একমত হয় এবং তার মতকে গ্রহণ করে, তাহলে তাকে অবশ্যই কৃতজ্ঞ হতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে, তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে এবং সে নিজের ত্রুটিগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

পরিচ্ছেদ- ৩

কীভাবে জ্ঞানী ব্যক্তিরা ধ্বংস হয়

তাক্বওয়া (সতর্কতা) এবং ভয় হলো জ্ঞানের উত্তরাধিকার এবং এর পরিমাপ। জ্ঞান হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার রশ্মি এবং 'ঈমান'- এর হৃদয়। যে তাক্বওয়া (সতর্কতা) উপেক্ষা করেছে সে জ্ঞানী ব্যক্তি নয়, এমনও যদি হয় সে জ্ঞানের অস্পষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)

''তাঁর দাসদের মাঝে একমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিরাই আল্লাহকে ভয় পায়।''(সূরা ফাতিরঃ ২৮)

জ্ঞানী ব্যক্তিরা আটটি জিনিসে ধ্বংস হয়ঃ লোভ এবং কৃপণতা, লোক দেখানো (রিয়া) এবং স্বজনপ্রীতি, প্রশংসার প্রতি ভালোবাসা, সে বিষয়ের ভিতরে সন্ধান করা যার বাস্তবতায় তারা পৌঁছাতে অক্ষম, অতিরঞ্জিত প্রকাশভঙ্গি দিয়ে বক্তব্যকে সৌন্দর্যমন্ডিত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সামনে বিনয়ের অভাব, আত্মম্ভরিতা এবং যা জানে সে অনুযায়ী কাজ না করা।

ঈসা (আ.) বলেছেনঃ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য হলো ঐ ব্যক্তি যে তার জ্ঞানের জন্য প্রসিদ্ধ, তার কাজের জন্য নয়।'' রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ''কোন বেয়াদব আহবানকারীর সাথে বসো না যে তোমাকে আহবান করে নিশ্চিত জ্ঞান থেকে সন্দেহের দিকে, আন্তরিকতা থেকে লোক দেখানোর দিকে, বিনয় থেকে অহংকারের দিকে, সৎ উপদেশ থেকে শত্রুতার দিকে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ থেকে আকাঙ্ক্ষার দিকে। তার কাছে যাও যে জ্ঞানী, যে তোমাকে আহবান করে অহংকার থেকে বিনয়ের দিকে, লোক দেখানো থেকে আন্তরিকতার দিকে, সন্দেহ থেকে নিশ্চিত জ্ঞানের দিকে, আকাঙ্ক্ষা থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের দিকে, শত্রুতা থেকে সৎ উপদেশ- এর দিকে।'' কোন ব্যক্তিই সৃষ্টির কাছে উপদেশ দেয়ার যোগ্যতা রাখে না শুধু সে ছাড়া যে এ খারাপ

জিনিসগুলোকে পিছনে ফেলতে পেরেছে তার সত্যবাদিতার মাধ্যমে। সে বক্তৃতার ত্রুটিগুলো দেখতে পায় এবং জানে কী সঠিক ও কী সঠিক নয় এবং চিন্তার ত্রুটিসমূহ এবং নফসের লালসা ও আকাঙ্ক্ষাগুলো সম্পর্কে জানে।

ইমাম আলী (আ.) বলেছেনঃ ''দয়ালু ও স্নেহশীল চিকিৎসকের মত হও যে ওষুধ নিবার্চন করে যা উপকারী হবে।'' তারা ঈসাকে (আ.) জিজ্ঞেস করলোঃ ''কার সাথে আমরা বসবো, হে রুহুল্লাহ?''

তিনি বললেনঃ ''তার সাথে যার চেহারা তোমাকে আল্লাহর কথা মনে করায় এবং যার কথা তোমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে এবং যার কাজ তোমাকে আখেরাতকে পেতে উৎসাহিত করে।''

নিজেকে পাহারা দেয়া (রিয়াইয়াহ)

যে তার হৃদয়কে কোন কিছু না শোনার প্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করে, নফসকে ক্ষুধা থেকে রক্ষা করে এবং অজ্ঞতার বিরুদ্ধে বুদ্ধিকে রক্ষা করে তাকে মুত্তাকীদের দলে প্রবেশ করানো হবে। এরপর যে তার জ্ঞানকে কল্পনাবিলাস থেকে রক্ষা করবে এবং সম্পদকে হারাম থেকে, তাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ''প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর জন্য জ্ঞান সন্ধান করা বাধ্যতামূলক।'' আর তাহলো নিজ সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান। অতএব সত্তার জন্য প্রয়োজন যে সে প্রত্যেক অবস্থায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে অথবা কৃতজ্ঞতার অভাব স্বীকার করে ক্ষমা চাইবে। যদি তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে তা হবে তার উপরে একটি নেয়ামত এবং যদি না হয় তাহলে তা হবে তার প্রতি (আল্লাহর) ন্যায়বিচার। প্রত্যেক সত্তার জন্য কাজ করা প্রয়োজন যেন তা আনুগত্যের কাজগুলোতে সফলতা লাভ করে এবং ক্ষতিকর কাজ করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টাকে রক্ষা করে চলে।

এসবের ভিত্তি হচ্ছে সব প্রয়োজন ও নির্ভরতা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপরে তা বুঝতে পারা এবং তাকওয়া ও আনুগত্য। এর চাবি হচ্ছে তোমার বিষয়গুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে ছেড়ে দেয়া, সব সময় মৃত্যুকে স্মরণ করে পাওয়ার আশাকে কেটে ফেলা এবং সর্ব- বাধ্যকারী আল্লাহর সামনে তুমি দাঁড়িয়ে আছো তা ভাবা। এটি তোমাকে বিশ্রাম দিবে বন্দীত্ব থেকে, উদ্ধার করবে শত্রু থেকে এবং সত্তাকে শান্তি দিবে । ইখলাস অর্জনের পথ হচ্ছে সুশৃংখল আনুগত্য এবং তার মূল নির্ভর করে জীবনকে 'একটি দিন'- এর মত বিবেচনা করাতে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ''এই পৃথিবীর জীবন এক ঘন্টার মত, তাই একে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আনুগত্যে ব্যয় করো।'' এ সবকিছুর দিকে দরজা হচ্ছে সর্বক্ষণ গভীর ভাবনার মাধ্যমে পৃথিবী থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়া। এ গুটিয়ে নেয়ার উপায় হচ্ছে সন্তুষ্টি এবং এমন সব পার্থিব বিষয় পরিত্যাগ করা যা তোমার সাথে সম্পর্কিত নয়। গভীর ভাবনার পথ হলো শূন্যতা

(আকাঙ্ক্ষাবিহীনতা) এবং শূন্যতার খুঁটি হচ্ছে নফসকে ‘বিরত রাখা’। ‘বিরত থাকার’ পূর্ণতা হলো তাক্বওয়া (সতর্কতা) এবং তাক্বওয়ার দিকের দরজা হলো ভয়। ভয়- এর প্রমাণ হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার হামদ ও তাসবীহ করা, আন্তরিকতার সাথে তার আদেশ মেনে চলাতে লেগে থাকা, ভয় ও সতর্কতা, এবং নিষিদ্ধ জিনিস থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা; আর এই পথের পথপ্রদর্শক হচ্ছে জ্ঞান।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)

‘‘তাঁর দাসদের মধ্যে তারাই আল্লাহকে ভয় করে যারা জ্ঞানী।’’ (সূরা ফাতিরঃ ২৮)

কৃতজ্ঞতা

প্রত্যেক শ্বাস নেয়ার সাথে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, নিশ্চয়ই হাজার ধন্যবাদ অথবা তারও বেশী। কৃতজ্ঞতার সবচেয়ে নিচের স্তর হচ্ছে রহমত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছ থেকে আসছে তা দেখতে পাওয়া, তার কারণ যাই হোক না কেন এবং সে কারণের সাথে হৃদয় যুক্ত না থাকা। এতে আছে- যা দেয়া হয়েছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা; এর অর্থ হচ্ছে তাঁর দেয়া নেয়ামতের বিষয়ে তার অবাধ্য না হওয়া অথবা তাঁর আদেশ ও নিষেধগুলোর বিরোধিতা না করা- তাঁর দান করা নেয়ামতের কারণে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার একজন কৃতজ্ঞ দাস হও সবদিক থেকে, তাহলে তুমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে সবদিক থেকে উদার রব হিসাবে দেখতে পাবে। যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার মুখলেস দাসদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ইবাদাতে প্রত্যেক অবস্থায় ধন্যবাদ জানানোর চাইতে কোন উত্তম পথ থাকতো তাহলে তিনি ঐ ইবাদাতকে অন্য সব সৃষ্টির উপরে নাম দিতেন। যেহেতু এর চাইতে উত্তম কোন ইবাদাত নেই তাই তিনি সব ইবাদাতের মধ্যে এ ইবাদাতকে বাছাই করেছেন এবং যারা এ ধরনের ইবাদাত করে তাদেরকে বাছাই করেছেন এই বলেঃ

(وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ)

''আমার দাসদের মধ্যে খুব অল্প ক'জনই কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী।'' (সূরা সাবাঃ ১৩)

পূর্ণ কৃতজ্ঞতা স্বীকার হলো সবচেয়ে কম কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তোমার অক্ষমতা নিয়ে দুঃখ করা এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রশংসা আন্তরিকভাবে করার মাধ্যমে তা প্রকাশ করা। কারণ ধন্যবাদ দেয়াটাও বান্দাহর উপর আল্লাহর একটি দান এবং এর জন্যও সে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবে। পূর্ববর্তী নেয়ামতের চাইতেও এটি বেশী মূল্যবান, যা তাকে প্রথম অবস্থায় ধন্যবাদ দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। তাই, যত বার একজন ধন্যবাদ দেয় তার জন্য উচ্চতর ধন্যবাদ দেয়া বাধ্যতামূলক হয়ে যায় এবং এভাবে তা চলবে অনন্তকাল পর্যন্ত, আর এভাবে সে তাঁর নেয়ামতে ডুবে থেকে কৃতজ্ঞতার সর্বোচ্চ অবস্থা অর্জনে অক্ষম হয়ে যায়। কারণ কীভাবে বান্দাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নেয়ামতের সমান কৃতজ্ঞতা জানাবে এবং কীভাবে সে আল্লাহর কাজের সাথে নিজের কাজ সমান করবে যখন সবসময়ই বান্দাহ হলো দূর্বল এবং তার কোন রকম শক্তি নেই শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছ থেকে ছাড়া?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার তাঁর বান্দাহদের কাছ থেকে আনুগত্যের প্রয়োজন নেই, কারণ চিরকালের জন্য নেয়ামত বৃদ্ধি করে যাওয়ার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। অতএব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার একজন কৃতজ্ঞ বান্দাহ হও এবং এভাবে তুমি আশ্চর্যজনক জিনিসগুলো দেখতে পাবে।

বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময়

যখন তুমি তোমার বাড়ি থেকে বের হও, তা এমনভাবে হও যেন তুমি আর ফেরত আসবে না। বের হও শুধু আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য অথবা ঈমানের জন্য। তোমার আচার- আচরণে প্রশান্ত অবস্থা ও মর্যাদা বজায় রাখো এবং আল্লাহকে স্মরণ করো গোপনে ও প্রকাশ্যে।

আবু যার- এর সাথীদের একজন আবু যার- এর পরিবারের একজনকে জিজ্ঞেস করলো সে কোথায়। সে নারী বললোঃ ''তিনি বাইরে গেছেন।''

যখন ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো কখন আবু যার ফিরবেন, ঐ নারী বললোঃ ‘‘কখন তিনি ফিরবেন তা আরেকজনের উপর নির্ভর করে, কারণ তার নিজের কোন ক্ষমতা নেই।’’ আল্লাহর ধার্মিক ও পথভ্রষ্ট বান্দাহদের কাছ থেকে শিখো, যেখানেই তুমি যাও। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে বলো তোমাকে তাঁর মুখলেস ও সত্যবাদী বান্দাহদের মাঝে স্থান দিতে এবং যারা চলে গেছে তাদের সাথে যুক্ত করতে এবং তাদের সাথে জড়ো করতে। তাঁর প্রশংসা করো এবং ধন্যবাদ দাও সে কারণে যেসব ক্ষুধা থেকে তিনি তোমাকে সরিয়ে রেখেছেন এবং অন্যায়কারীদের কুৎসিৎ কাজ থেকে তোমাকে তিনি রক্ষা করেছেন বলে। তোমার দৃষ্টিকে নামিয়ে রাখো অশ্লীল কামনা ও নিষিদ্ধ জিনিস থেকে এবং তোমার ভ্রমণে সঠিক পথ অনুসরণ করো। সতর্ক দৃষ্টি রাখো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে ভয় করো প্রত্যেক পদক্ষেপে, যেন তুমি পুলসিরাত পার হচ্ছো। মনযোগ হারিয়ো না। তাঁর লোকদেরকে সালাম বলো- প্রথমে সালাম দিয়ে এবং উত্তর দিয়ে। তাদের সাহায্য করো যারা সৎকাজের জন্য তা চায়, তাদের পথ দেখাও যারা পথ হারিয়ে ফেলেছে এবং মূর্খদের উপেক্ষা করো।

যখন তুমি বাড়িতে ফেরত আসো- এতে প্রবেশ করো যেভাবে একটি লাশ কবরে প্রবেশ করে, যার একমাত্র চিন্তা হলো আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা লাভ করা।

কোরআন তেলাওয়াতের বিষয়ে

যে কোরআন তেলাওয়াত করে এবং নিজেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সামনে বিনয়ী করে না, যার অন্তর নরম হয় না, অনুতপ্ত হয় না এবং তাঁর ভিতরে ভয় জাগে না, সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বিষয়ের বিরাটত্বকে যথাযথ মূল্য দেয় না এবং সে স্পষ্টভাবে ক্ষতির মধ্যে আছে।

যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত করবে তার তিনটি জিনিস প্রয়োজনঃ একটি ভীতিপূর্ণ অন্তর, প্রশান্ত ও গ্রহণে আগ্রহী শরীর এবং একটি যথাযথ তেলাওয়াতের স্থান।

যখন তার অন্তর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে ভয় করে তখন অভিশপ্ত শয়তান তার কাছ থেকে পালায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

(فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)

''যখন তুমি কোরআন পড়, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও অভিশপ্ত শয়তান থেকে।'' (সূরা নাহলঃ ৯৮)

যখন সে সব ধরনের সংযুক্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করে তখন তার অন্তর তেলাওয়াতে মগ্ন হয় এবং কোরআনের নূর ও এর উপকারিতা লাভে তাকে কোন কিছু বাধাগ্রস্থ করে না। যখন সে একটি নির্জন জায়গা পায় এবং মানুষজন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয় দু'টি গুণাবলী নিয়ে- অন্তরের বিনয় এবং শারীরিক প্রশান্তি, তখন তার আত্মা এবং তার বাতেনী সত্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে মিলন অনুভব করবে, এবং সে আবিষ্কার করবে, সেই মিষ্টি স্বাদ যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার সৎকর্মশীল বান্দাহর সাথে কথা বলেন, কীভাবে তিনি তাদের সাথে তাঁর নম্রতা প্রকাশ করেন এবং তাদেরকে বাছাই করেন তাঁর বিভিন্ন সম্মানজনক চিহ্ন ও আশ্চর্যজনক নিদর্শনের জন্য। যদি সে সেই শরবতের এক পেয়ালা পান করে সে কখনোই আর এই অবস্থা ও এই মুহূর্তটির চেয়ে অন্য কিছুকে বেশী চাইবে না। সে এটিকে প্রত্যেক আনুগত্য ও মগ্নতার উপরে স্থান দিবে যেহেতু তাতে রয়েছে রবের সাথে কথপোকথন- কোন মাধ্যম ছাড়াই।

তাই সাবধান হও কীভাবে তুমি তোমার রবের কিতাব পড়, যিনি তোমার অভিভাবক, যাকে তুমি চাও, কীভাবে তুমি তাঁর আদেশে সাড়া দাও এবং তাঁর নিষেধগুলো এড়িয়ে চল এবং কীভাবে তুমি তাঁর সীমানা মেনে চল, কারণ তা এক মহাক্ষমতাবান কিতাবঃ

(لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ)

''মিথ্যা- এর মাঝে প্রবেশ করবে না সামনে থেকে অথবা পিছন থেকে, তা নাযিল হয়েছে প্রজ্ঞাবান ও প্রশংসিত- এর কাছ থেকে।'' (সূরা হা- মীম আস- সাজদাহঃ ৪২)

অতএব তা তেলাওয়াত করো ধারাবাহিকভাবে এবং গভীর ভাবনার সাথে এবং তার প্রতিশ্রুতি ও হুমকির সীমানা মেনে চলো। এর উদাহরণ ও সতর্কবানীর উপর গভীরভাবে ভাবো। সতর্ক থাকো শুধু এর অক্ষরগুলোর তেলাওয়াতকে অযাচিত মর্যাদা দেয়া থেকে এবং একই সময়ে এর ভেতরে থাকা আইনগত সীমানা মেনে চলতে ব্যর্থ হওয়া থেকে।

পরিচ্ছেদ- ৪

পোষাক

বিশ্বাসীর পোষাকের শ্রেষ্ঠ অলংকার হচ্ছে তাক্বওয়া (সতর্কতা) এবং সবচেয়ে বেশী রহমতপ্রাপ্ত পোষাক হচ্ছে ঈমান। যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ)

''এবং যে পোষাক পাহারা দেয় (অন্যায়ের বিরুদ্ধে); তা সর্বোত্তম।'' (সূরা আরাফঃ ২৬)

বাইরের পোষাক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছ থেকে একটি নেয়ামত যা আদমের সন্তানদের ভদ্রতা বজায় রাখার জন্য দেয়া হয়েছে; এটি সম্মানের একটি চিহ্ন যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আদমের বংশধরদের দিয়েছেন। তিনি এ সম্মান অন্য কোন প্রাণীকে দেন নি। এটি বিশ্বাসীদের দেয়া হয়েছে তাদের দায়িত্ব পালনের একটি মাধ্যম হিসাবে। তোমার শ্রেষ্ঠ পোষাকগুলো হচ্ছে সেগুলো যা তোমাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেয় না, যে পোষাকগুলো প্রকৃতপক্ষে তোমাকে আল্লাহর স্মরণ এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা এবং আনুগত্যের কাছে আনে। যেগুলো তোমাকে পরিচালিত করে না অহংকার, ধোঁকা, কপটতা, গর্ব অথবা দাম্ভিকতার দিকে; কারণ এগুলো ধ্বংসকারী দুর্যোগ এবং এসবের পরিণতি হচ্ছে হৃদয়ের কাঠিন্য।

যখন তুমি তোমার পোষাক পরবে তখন স্মরণ করো যে আল্লাহ তাঁর রহমত দিয়ে তোমার ভুল কাজগুলো ঢেকে দেন। তোমার উচিত তোমার ভিতরের অংশকে ঢেকে দেয়া যেভাবে তুমি তোমার পোষাক দিয়ে বাইরের অংশকে ঢেকে দিচ্ছো। তোমার ভিতরের সত্য ঢেকে যাক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভয়ে এবং তোমার বাইরের সত্য ঢেকে যাক আনুগত্যে।

আল্লাহর উপচে পড়া নেয়ামতকে স্মরণ রাখো। যেহেতু তিনি শারীরিক অভদ্রতা ঢাকতে পোষাক তৈরীর উপায় উপকরণ সৃষ্টি করেছেন এবং দরজা খুলে দিয়েছেন তওবা, অনুতাপ ও সাহায্য

প্রার্থনার জন্য, যেন ভিতরের অংশ এবং সেগুলোর ভুল কাজ ও খারাপ চরিত্রকে ঢেকে দিতে পারেন।

অন্যের দোষ প্রকাশ করে দিও না যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তোমার ভিতরে এর চেয়ে খারাপ জিনিস গোপন করেছেন। নিজের ত্রুটিগুলো নিয়ে চিন্তা করো এবং সে বিষয় ও পরিস্থিতিগুলো উপেক্ষা করো যা তোমার সাথে সম্পর্কিত নয়। সাবধান থাকো হয়তো তুমি অন্যের কাজ কর্মের বিষয়ে নিজের জীবনকে খরচ করে ফেলবে এবং তোমাকে দানকৃত অপূরণীয় সম্পদ অন্যের সাথে বিনিময় করে ফেলবে এর মাধ্যমে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে। অন্যায় কাজগুলোকে ভুলে যাওয়া আল্লাহর সবচেয়ে বড় শাস্তি আনে এ পৃথিবীতে এবং আখেরাতে তা হয় শাস্তির প্রধান কারণ। যতক্ষণ বান্দাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে মেনে চলায় ব্যস্ত থাকে, নিজের দোষগুলো স্বীকার করে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি ঈমান কমে যাবে এমন জিনিস পরিত্যাগ করে তখন সে ধ্বংস থেকে রক্ষা পায় এবং সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার রহমতের সমূদ্রে নিমজ্জিত হয় এবং প্রজ্ঞা ও স্বচ্ছ জ্ঞানের মুক্তা ও উপকারিতা লাভ করে।

কিন্তু যখন সে ভুলে যায় নিজের অন্যায় কাজগুলো এবং নিজের ত্রুটিগুলো সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে এবং তার ক্ষমতা ও শক্তিতে পিছিয়ে পড়ে, সে কখনো সফল হবে না।

লোক দেখানো (রিয়া)

নিজের কাজকে এমন কাউকে দেখিও না যে না পারে জীবন দিতে আর না পারে মৃত্যু দিতে এবং যে তোমার বোঝা নিতে পারে না। ‘লোক দেখানো’ হলো একটি গাছ যার ফল হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে অন্য খোদাদের গোপনে শরীক করা এবং এর শিকড় হচ্ছে মোনাফেক্বী। বিচার দিনে মোনাফেক্বকে বলা হবেঃ ‘‘তোমার কাজের পুরস্কার যা তুমি মনে কর তা নাও তাদের কাছ থেকে যাদেরকে তুমি আমার অংশীদার হিসেবে নিয়েছিলে। তাদের কাছে চাও যাদের ইবাদাত তুমি করেছিলে এবং ডেকেছিলে, যাদের কাছ থেকে তুমি আশা করেছিলে এবং যাদেরকে তুমি ভয় করতে। জেনে রাখো তোমার ভিতরের কোন কিছু আল্লাহর কাছ থেকে লুকাতে পারো নাঃ তুমি প্রতারিত হবে তোমাকে দিয়েই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

(يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ)

‘‘তারা ধোঁকা দিতে চায় আল্লাহকে ও বিশ্বাসীদের, কিন্তু তারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয় এবং তারা তা বুঝে না। (সূরা বাকারাঃ ৯)

লোক দেখানো সবচেয়ে বেশী ঘটে – যেভাবে মানুষ অন্যের দিকে তাকায়, কথা বলে, খায়, পান করে, কোন জায়গায় আগমন করে, যেভাবে অন্যের সাথে বসে, পোষাক পরে, হাসে এবং যেভাবে তারা নামাজ পড়ে, হজ্ব করে, জিহাদ করে, কোরআন তেলাওয়াত করে এবং যেভাবে সব ধরনের বাহ্যিক ইবাদাত করে। কিন্তু যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি আন্তরিক, যে তাঁকে অন্তরে ভয় করে এবং যে নিজেকে সব প্রচেষ্টার পরও পিছিয়ে আছে দেখতে পায় সে এর ফলাফল হিসাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে পাবে তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং সে তাদের একজন হবে যারা লোক দেখানো ও মোনাফেক্বী থেকে মুক্ত হওয়ার আশা রাখে, তবে এ শর্তে যে সে ঐ অবস্থায় পথ চলতে থাকে।

সত্যবাদিতা

সত্যবাদিতা একটি নূর যা 'এর পৃথিবীতে' বাস্তবে আলো বিকিরণ করেঃ এটি সূর্যের মত, যার বাস্তবতা থেকে সবকিছু আলো খোঁজে, এ বাস্তবতায় কোন হ্রাস পাওয়া ছাড়াই। প্রকৃতপক্ষে একজন সত্যবাদী ব্যক্তি প্রত্যেক মিথ্যাবাদীকে বিশ্বাস করে তার সত্যবাদিতার বাস্তবতার কারণে। এর অর্থ হলো সত্যবাদিতার বিরোধী কোন কিছু- এমনকি যা সত্যবাদিতা নয় তাও এর সাথে একই জায়গায় বাস করতে অনুমোদিত, যা আদমের ক্ষেত্রে ঘটেছিলো- সে ইবলিসকে বিশ্বাস করেছিলো যখন সে মিথ্যা বলেছিলো। ইবলিস মিথ্যা শপথ করেছিলো আর আদমের ভিতরে কোন মিথ্যা কথা ছিলো না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

(فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا)

''আমরা তার ভিতরে দৃঢ়তা পাই নি।'' (সূরা ত্বোয়া- হাঃ ১১৫)

কারণ ইবলিস এমন কিছু আবিষ্কার করেছিলো যা আগে জানা ছিলো না, প্রকাশ্যেও এবং গোপনেও। ইবলিসকে হাজির করা হবে তার মিথ্যার সাথে এবং সে কখনোই আদমের সত্যবাদিতা থেকে লাভবান হবে না। অথচ তা থেকে আদম লাভবান হয়েছে, যে ইবলিসের মিথ্যা কথা বিশ্বাস করেছিলো যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সাক্ষ্য দিয়েছেন তার জন্য যখন তিনি বলেছেন যে সে (আদম) অনড় থাকতে পারে নি সে বিষয়ে যা তার আচরণের বিপরীত ছিলো। তা প্রকৃতপক্ষে এটিই বুঝায় যে তার নির্বাচিত হওয়া শয়তানের মিথ্যাতে হারিয়ে যায় নি। সত্যবাদিতা হচ্ছে সত্যবাদীর বৈশিষ্ট্য। সত্যবাদিতার বাস্তবতা দাবী করে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর বান্দাহকে পবিত্র করবেন যে রকম তিনি ঈসার (আ.) সত্যবাদিতা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন- যা ঘটবে বিচার দিনে।

তিনি তা ইঙ্গিত করেছেন মুহাম্মাদ (সা.)- এর সম্প্রদায়ের সত্যবাদী লোকদের নির্দোষিতা উল্লেখ করেঃ

(هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ)

''আজ সেইদিন যেদিন সত্যবাদীদের জন্য তাদের সত্য লাভ বয়ে আনবে।'' (সূরা মায়িদাঃ ১১৯)

আমিরুল মুমিনীন বলেছেনঃ ''সত্যবাদীতা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার একটি তরবারী- তাঁর আকাশে ও পৃথিবীতে; প্রত্যেক জিনিসকে তা কেটে ফেলে যা তা স্পর্শ করে।'' তুমি যদি জানতে চাও তুমি সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী, তাহলে তুমি সত্যবাদিতা বলতে যা বুঝাও ও এ জন্য তোমার দাবীর সবকিছুর দিকে তাকাও। এরপর এ দুটোকে ওজন করো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছ থেকে একটি পাল্লাতে, যেন এমন যে তুমি হাশরের দিনে উপস্থিত আছো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

(وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ)

''এবং সে দিনের মাপ হবে নিখুঁত।'' (সূরা আরাফঃ ৮)

তুমি যা বুঝাতে চাও তাতে যদি সাম্য ও যথার্থতা থাকে তাহলে তোমার দাবী সফল এবং তোমার সত্যবাদিতা সত্য যখন জিহবা হৃদয়ের সাথে ভিন্নমত রাখে না এবং না হৃদয় জিহবা- এর সাথে ভিন্নমত রাখে। এ বর্ণনায় সত্যবাদী ব্যক্তি হলো সেই ফেরেশতার মত যে তার আত্মাকে বের করে আনে; যদি আত্মাকে বের করে আনা না হয় তাহলে সে আর কী করবে?

ইখলাস (বিশুদ্ধ আন্তরিকতা)

প্রত্যেক সম্মানিত কাজের ভিতরে ইখলাস রয়েছে। এটি একটি মনোভাব যা শুরু হয় গ্রহণ (ক্ববুল হওয়া) দিয়ে এবং শেষ হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টি দিয়ে। অতএব যার কাজ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা গ্রহণ করেন এবং যার উপরে তিনি সন্তুষ্ট সে হচ্ছে মুখলেস ব্যক্তি, তার কাজের পরিমাণ খুব কম হওয়া সত্ত্বেও। যার কাজ গৃহীত হয় না সে মুখলেস নয়, তার কাজের পরিমাণ বেশী হওয়া সত্ত্বেও। যেভাবে আমরা দেখি আদম (আ.) ও ইবলিস (তার উপর লানত)- এর মাঝে কী ঘটেছিলো ।

ক্ববুল হওয়ার নিদর্শন হচ্ছে সত্যবাদিতা এবং সঠিকতার উপস্থিতি- যা আশা করা হয় সবকিছু ব্যয় করার পর, প্রত্যেক নড়াচড়া ও স্থিরতায় সঠিক সচেতনতা বজায় রেখে। তার যা আছে তা ধরে রাখতে মুখলেস ব্যক্তির সত্তা নিয়োজিত থাকে এবং তার জীবন ব্যয় হয় তার যা আছে তা গুছিয়ে নিতে এবং জ্ঞান ও কাজ এবং কর্মী ও কর্মের মধ্যে ঐক্য আনতে। যদি সে তা অর্জন করে থাকে তাহলে সে সব অর্জন করেছে এবং যদি সে তা হারায় তাহলে সে সব হারায়; এবং তা বাস্তবায়িত হয় শিরকহীনতার (তারযিহ) অর্থকে পবিত্র করার মাধ্যমে। যেমন প্রথম ইমাম বলেছেনঃ ''যারা কাজ করে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে তারা ছাড়া যারা ইবাদাত করে; যারা ইবাদাত করে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে তারা ছাড়া যারা জানে; যারা জানে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে তারা ছাড়া যারা সত্যবাদী; যারা সত্যবাদী তারা ধ্বংস হয়ে যাবে তারা ছাড়া যারা মুখলেস (আন্তরিক); যারা মুখলেস তারা ধ্বংস হয়ে যাবে তারা ছাড়া যারা মুত্তাক্বী (সতর্ক); যারা মুত্তাক্বী তারা ধ্বংস হয়ে যাবে তারা ছাড়া যারা নিশ্চিত (ইয়াক্বীন) হয়েছে; এবং যারা নিশ্চিত হয়েছে তারা সুমহান চরিত্রের; যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ)

''এবং তোমার রবের দাসত্ব করো ঐ পর্যন্ত যখন তোমার ইয়াক্বীন এসে যাবে।'' (সূরা হিজরঃ ৯৯)

একদম নীচের ইখলাস হলো যখন বান্দাহ নিজের উপর চাপ প্রয়োগ করে যতটুকু তার পক্ষে সম্ভব এবং এরপর সে তার কাজের কোন মূল্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে আছে বলে মনে করে না যার কারণে সে তার রবকে তার কাজের পুরস্কার দিতে বলবে তার জ্ঞান অনুযায়ী, কারণ যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে দাসত্বের (উবুদিয়াহ) সব দায়িত্ব পালন করতে বলেন তখন সে তা করতে পারবে না। মুখলেস ব্যক্তির সর্বনিম্ন মাক্বাম হলো এ পৃথিবীতে সব অন্যায় কাজ থেকে নিরাপত্তা এবং আগুন থেকে রক্ষা পাওয়া এবং পরবর্তী পৃথিবীতে জান্নাত পাওয়া।

পরিচ্ছেদ- ৫

তাক্বওয়া (সতর্কতা)

তাক্বওয়ার তিনটি স্তর আছেঃ

১। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর নির্ভর করে তাক্বওয়া। যার অর্থ হচ্ছে পরস্পরবিরোধী বিষয়গুলো পরিত্যাগ করা এবং সামান্য সন্দেহকেও পরিত্যাগ করা এবং এটিই হচ্ছে তাক্বওয়া যা সর্বোচ্চস্থানীয় ব্যক্তিরা অনুশীলন করে।

২। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বিষয়ে তাক্বওয়া। যার অর্থ হচ্ছে সব সন্দেহপূর্ণ বিষয় পরিত্যাগ করা এবং নিষিদ্ধকে (হারাম) সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা, এটি উচ্চ শ্রেণীর লোকদের তাক্বওয়া।

৩। আগুন ও শাস্তির বিরুদ্ধে তাক্বওয়া। যার পরিণতিতে হারামকে পরিত্যাগ করা হয়- এটি সাধারণ জনগণের তাক্বওয়া।

তাক্বওয়া হচ্ছে পানির মত যা একটি নদীতে বইছে। তাক্বওয়ার তিনটি স্তর হলো সব রং- এর ও প্রকারের গাছ যা ঐ নদীর তীরে রোপন করা হয়েছে। প্রত্যেক গাছ নদী থেকে পানি শোষণ করে তার মর্ম, ক্ষমতা, তার কোমলতা এবং স্থূলতা অনুযায়ী।

এরপর সেসব গাছ এবং ফল থেকে প্রাণীরা যে উপকারিতা লাভ করে তা তাদের মান ও মূল্য অনুযায়ী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ)

''খেজুর গাছগুলোর একটি শিকড় এবং (অন্যদের) বিভিন্ন শিকড়- তারা একই পানি থেকে সিক্ত হয় এবং তাদের কিছুকে আমরা অন্যগুলোর চাইতে বেশী ফল দান করি।'' (সূরা রা'দঃ ৪)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আনুগত্যে তাক্বওয়া হচ্ছে গাছগুলোর জন্য পানির মত এবং গাছগুলোর প্রকৃতি এবং তাদের বিভিন্ন রং ও স্বাদের ফলগুলো হচ্ছে বিশ্বাসের মাত্রার মত। যার

আছে সর্বোচ্চ মাত্রার বিশ্বাস এবং আত্মায় আছে বিশুদ্ধতম প্রকৃতি তার আছে সর্বোচ্চ তাক্বওয়া। যে ব্যক্তি মুত্তাক্বী তার ইবাদাত হচ্ছে শুদ্ধতর ও বেশী আন্তরিক এবং যে এরকম সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নিকটতর।

কিন্তু প্রত্যেক ইবাদাত যা তাক্বওয়া ছাড়া অন্য কিছুর উপরে প্রতিষ্ঠিত তার ফলাফল শূন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ)

''তাই সে কি উত্তম যে তার ভিত্তি স্থাপন করেছে আল্লাহ ভীতি ও তার সন্তুষ্টির উপরে, নাকি সে যে তার ভিত্তি স্থাপন করেছে এক ভঙ্গুর, ফাপাঁ তীরের উপর, এতে তা তাকে নিয়ে ভেঙ্গে পড়েছে জাহান্নামের আগুনের ভিতর?'' (সূরা তওবাঃ ১০৯)

তাক্বওয়ার ব্যাখ্যা হচ্ছে ক্ষতিকর কিছু না থাকা সত্ত্বেও কোন বিষয়ে প্রবেশ না করা – শুধু এ ভয়ে যে তাতে এরকম কিছু রয়েছে। বাস্তবে তা হলো বিদ্রোহ ছাড়া আনুগত্য, ভুলে যাওয়া ছাড়া স্মরণ, অজ্ঞতা ছাড়া জ্ঞান এবং তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা গ্রহণ করেন এবং তা প্রত্যাখ্যাত হয় না।

আল্লাহ ভীতি

তোমার অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়গুলোর দরজা বন্ধ করে দাও সেসব জিনিসের উপর যা তোমার অন্তরকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে তোমার খারাপ অবস্থান সরিয়ে ফেলো এবং এর পিছনে আনো কেয়ামতের দিনের শোক ও অনুতাপ এবং যত খারাপ কাজ করেছো তার জন্য লজ্জা। একজন সাবধানী ব্যক্তির অবশ্যই তিনটি নীতি থাকতে হবেঃ সে সব মানুষের ত্রুটি উপেক্ষা করবে, সে তাদেরকে অপমান করা থেকে বিরত থাকবে এবং তার উচিত তিরস্কারের পর প্রশংসা করে সাম্য আনা।

আল্লাহ ভীতির ভিত্তি হচ্ছে সর্বক্ষণ নিজের হিসাব নেওয়া। কথায় সত্যবাদী হওয়া ও লেনদেনে বিশুদ্ধ হওয়া, প্রত্যেক সন্দেহপূর্ণ জিনিস ছেড়ে দেয়া, প্রত্যেক ত্রুটি ও সন্দেহ পরিত্যাগ করা, যা তোমার সাথে সম্পর্কিত নয় সেসব কিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং সে দরজাগুলো না খোলা যেগুলো তুমি জানবে না কীভাবে বন্ধ করতে হয়।

তার সাথে বসো না যে তোমার কাছে যা স্পষ্ট তা অস্পষ্ট করে তোলে, তার সাথেও নয় যে বিশ্বাসকে হালকা ভাবে নেয়। সে জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন করো না যার জন্য তোমার অন্তরের ক্ষমতা নেই এবং যা তুমি বুঝতে পারবে না- তা যেই বলুক এবং তাকে কেটে দাও যে তোমাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছ থেকে কেটে দেয়।

সামাজিক মেলামেশা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সৃষ্টির সাথে সামাজিক সৌজন্যমূলক সম্পর্ক রাখার সময় তাঁর অবাধ্য হওয়ার মত সব কাজ এড়িয়ে চলা বান্দাহর উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অতিরিক্ত উদারতার চিহ্ন। যে তার গভীরতম সত্তায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি আন্তরিক ও বিনয়ী তার বাহ্যিক দিকে ভালো সামাজিক মেলামেশা থাকবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কারণে লোকজনের সাথে মিশো এবং মেলামেশা করো না শুধু পৃথিবীর বিষয়ে তোমার অংশের জন্য, মর্যাদা লাভের জন্য, লোক দেখানোর জন্য অথবা সুখ্যাতির জন্য। শরিয়তের সীমা রক্ষায় ব্যর্থ হয়ো না সামাজিক মেলামেশার কারণে। যেমনঃ অন্যের সাথে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা অথবা সুখ্যাতি অর্জনের জন্য, কারণ এগুলো তোমার ক্ষতি পূরণ করবে না এবং তুমি আখেরাত হারাবে কোন ফিরতি সুযোগ ছাড়া। তোমার চেয়ে বয়সে বড়দের সাথে এমন আচরণ করো যেমন করতে তোমার বাবার সাথে এবং তোমার চেয়ে বয়সে ছোটদের সাথে তেমন যেমন করতে তোমার সন্তানের সাথে। তোমার সমবয়সীদের সাথে আচরণ করো যেমন করতে ভাইয়ের সাথে। তুমি নিজে যা নিশ্চিত জানো তা বদল করো না ঐ জিনিসের সাথে যা তুমি অন্যের কাছ থেকে শুনেছো এবং যা তুমি সন্দেহ কর। নম্র হও যখন তুমি সৎকাজের আদেশ কর এবং দয়ালু হও যখন তুমি খারাপকে নিষেধ কর। কখনোই কোন পরিস্থিতিতে ভালো উপদেশ পরিত্যাগ করো না। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا)

''মানুষের সাথে ভালো কথা বলো'' (সূরা বাকারাঃ ৮৩)

সেসব জিনিস থেকে নিজেকে কেটে ফেলো যা তোমাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার স্মরণ ভুলিয়ে দেয়, যখন 'লোভ জাগা' তোমাকে তাঁর আনুগত্য থেকে অমনোযোগী করে দেয় – কারণ তা আসে শয়তানের বন্ধু ও সাহায্যকারীদের কাছ থেকে। তাদেরকে দেখা যেন তোমাকে সত্যের অনুসরণ থেকে সরিয়ে না দেয়। কারণ তা হবে অবশ্যই এক ভয়ানক ক্ষতি। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

ঘুম

মনোযোগী লোকের ঘুম ঘুমাও, উপেক্ষাকারীর ঘুম ঘুমিয়ো না, বুঝদারদের মাঝে মনোযোগীরা ঘুমায় শুধু বিশ্রামের জন্য এবং অলসতার কারণে ইচ্ছা করে ঘুমিয়ো না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ‘‘আমার চোখগুলো ঘুমায় কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।’’ যখন তুমি ঘুমের জন্য শোও এ নিয়ত রাখো যে তুমি ফেরেশতাদের উপর তোমার বোঝা লাঘব করবে এবং নফসকে এর ক্ষুধা থেকে বিচ্ছিন্ন করবে এবং ঘুমের মাধ্যমে নিজেকে পরীক্ষা করবে; এ সত্যকে জেনে রাখো যে তুমি অক্ষম ও দূর্বল। তোমার কোন শক্তি নেই তোমার নড়াচড়া ও স্থিরতার উপর – আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার হুকুম ও পরিমাণ ছাড়া। মনে রেখো ঘুম হচ্ছে মৃত্যুর ভাই। এটিকে ব্যবহার করো মৃত্যুর দিকে পথ প্রদর্শক হিসেবে, কারণ মৃত্যু থেকে জেগে উঠার কোন পথ নেই অথবা ফিরে এসে তোমার কাজকে শুদ্ধ করা নেই যা তুমি হারিয়েছো। যে ব্যক্তি ওয়াজিব ও নফল নামাজের সময় ঘুমিয়ে পার করে দেয় তার ঘুম হচ্ছে উপেক্ষাকারীদের ঘুম এবং তার পথ হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্থদের পথ; সে দোষী। যে তার বাধ্যতামূলক ও নফল নামাজের দায়িত্ব সম্পাদন করেছে এবং তার দায়িত্বসমূহ পালন করেছে সে একটি প্রশংসিত ঘুম ঘুমাচ্ছে। আমাদের সময়ে যারা এ গুণাবলী অর্জন করেছে তাদের জন্য ঘুমের চাইতে নিরাপদ আর কিছু আমি জানি না। কারণ লোকেরা তাদের বিশ্বাসকে পাহারা দেয়া এবং তাদের আচরণের যত্ন নেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। তারা তাদের বাম দিকের পথ ধরেছে। যখন একজন মুখলেস বান্দাহ বেজায়গায় কথা না বলার জন্য সংগ্রাম করে, তখন কীভাবে সে সে কথা শোনা এড়িয়ে যাবে যা তাকে ‘কথা না বলা’ থেকে বাধা দিবে যদি তার একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকে? ঘুম হচ্ছে এমন একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا)

‘‘নিশ্চয়ই শ্রবনশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি এবং অন্তর, এসব কিছুকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে।’’ (সূরা বনী ইসরাইলঃ ৩৬)

অতিরিক্ত ঘুমের মধ্যে অনেক খারাপ লুকায়িত আছে – আমরা যেভাবে উল্লেখ করেছি যদি সেভাবেও হয়। খুব বেশী ঘুম আসে অতিরিক্ত পানে এবং অতিরিক্ত পান আসে অতিরিক্ত তৃপ্তি থেকে। এ দু’টোই নফসের উপর ভারী হয়ে দেখা দেয় আনুগত্য করার পথে এবং এগুলো অন্তরকে গভীর ভাবনা এবং বিনয়ী না করে শক্ত করে দেয়।

তোমার ঘুমকে এ পৃথিবীর শেষ বিষয় বানিয়ে ফেলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে স্মরণ করো তোমার অন্তর ও জিহবা দিয়ে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি তোমার আনুগত্য দিয়ে তোমার অন্যায় কাজকে পরাভূত করো এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাও যখন তুমি ঘুমাও সকালের নামাজ পর্যন্ত উপাস থেকে। যদি তুমি রাতে জেগে উঠো, শয়তান তোমার কানে ফিসফিস করে বলেঃ ''আবার ঘুমাও, এখনও তোমার জন্য লম্বা রাত রয়েছে, '' কারণ সে চায় তুমি নিবিড় আত্ম পর্যালোচনা এবং তোমার রবের সামনে তোমার অবস্থা তুলে ধরা হারাও। মনোযোগ হারিয়ো না সকালে ক্ষমা চাইতে, কারণ সে সময় প্রার্থনায় মগ্নদের মাঝে দেখা দেয় আল্লাহকে পাওয়ার অনেক আকাঙ্ক্ষা।

পরিচ্ছেদ- ৬

হজ্ব

যদি তুমি হজ্বে যেতে চাও, তাহলে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তোমার অন্তরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি নিবদ্ধ কর একে বিচ্ছিন্ন করে এবং তোমার ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার মাঝে প্রত্যেক বাধা থেকে একে মুক্ত করে। তোমার সৃষ্টিকর্তার উপরে তোমার সব বিষয় ছেড়ে দাও, তাঁর উপর নির্ভর করো তোমার প্রত্যেক কর্মে ও স্থিরতার প্রত্যেক মুহূর্তে, আত্মসমর্পন করো তাঁর আদেশ, সিদ্ধান্ত এবং রায়ের কাছে। পরিত্যাগ করো এ পৃথিবীকে, বিশ্রামকে এবং এবং সব সৃষ্টিকে। সেসব দায়িত্ব পালন করো যেগুলো তুমি অন্য লোকদের জন্য পালন করতে দায়বদ্ধ। নির্ভর করো না তোমার রিযেক্বর উপর, যে পশুর উপর তুমি আরোহন কর, তোমার সাথীদের উপর না তোমার খাদ্য এবং তোমার যৌবন ও না তোমার সম্পদের উপর। কারণ ভয় করো যে এগুলো তোমার শত্রু হয়ে যাবে এবং তোমার জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে। এভাবে তুমি বুঝতে পারবে যে কোন ক্ষমতা ও কোন শক্তি নেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অভিভাবকত্ব ও তাঁর পক্ষ থেকে সফলতা দান করা ছাড়া।

হজ্বের জন্য প্রস্তুতি নাও সে ব্যক্তির মত যে ফেরত আসবে আশা করে না। ভালো লোকদের সাথী হও এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ও রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর প্রতি তোমার সব দায়িত্ব পালনে পরিশ্রমী হও। যত্নবান হও – সৌজন্য দেখানোতে, অধ্যাবসায়তে, ধৈর্য ধরাতে, কৃতজ্ঞতা স্বীকারে, দয়া করাতে এবং উদারতায় – সব সময় অন্যকে নিজের আগে রেখে, তাদেরকেও যারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে। এরপর অযু কর আন্তরিক তওবার পানি দিয়ে অন্যায় কাজের কারণে। পোষাক পড় সত্যবাদিতার, পবিত্রতার, বিনয়ের এবং ভয়ের। হজ্বের পোষাক পড়ে নিজেকে বিরত রাখো প্রত্যেক জিনিস থেকে যা তোমাকে বাধা দেয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার স্মরণে। নয়তো তা তোমাকে বাধা দিবে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশে।

তাঁর আহবানে সাড়া দাও এক উত্তর দিয়ে যার অর্থ স্পষ্ট, বিশুদ্ধ এবং আন্তরিক। যখন তুমি তাঁকে ডাকো, তাঁর প্রতি তোমার বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখো। তাওয়াফ কর তোমার অন্তর দিয়ে ফেরেশতাদের সাথে যারা আরশকে তাওয়াফ করে যেভাবে তুমি তাওয়াফ কর মুসলিমদের সাথে যারা কাবাকে প্রদক্ষিণ করে। দ্রুত এগিয়ে যাও যখন তুমি দৌড় দাও ভয়ে, তোমার কামনা বাসনা থেকে, শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে ব্যক্তিগত সব অনুমান থেকে নিজেকে মুক্ত করে। যখন তুমি মিনাতে যাও পিছনে ফেলে যাও কথা গ্রাহ্য না করার স্বভাবকে এবং ভুলগুলোকে। তা চেও না যা তোমার জন্য হারাম এবং যা পাওয়ার যোগ্য তুমি নও। তোমার দোষগুলো স্বীকার করো আরাফাতে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে তোমার চুক্তি মেলে ধর, তাঁর তাওহীদের শপথের মাধ্যমে তাঁর নিকটবর্তী হও ও তাঁকে ভয় করো মুযদালিফাতে। তোমার আত্মা নিয়ে সর্বোচ্চ সমাবেশে আরোহন করো যখন তুমি আরাফাতের পর্বতে আরোহন করো। কামনা বাসনা ও লোভের গলাকে কেটে ফেলো কোরবানীতে। পাথর মারো তোমার ক্ষুধাকে, হীন অবস্থাকে, অশ্লীলতাকে এবং দোষনীয় কাজগুলোকে যখন তুমি আক্বাবাহর স্তম্ভকে পাথর ছুঁড়ে মারো। তোমার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দোষগুলোকে কামিয়ে ফেলো যখন তুমি তোমার মাথা কামাও এবং প্রবেশ করো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নিরাপত্তা বেষ্টনীতে তাঁর আশ্রয়ে তাঁর চাদরের ভিতরে, তাঁর নিরাপত্তার ঘরে এবং তাঁর সতর্ক পাহারার ভিতরে এবং তোমার আশা আকাঙ্ক্ষার পিছনে ছোটা পরিত্যাগ করো তার পবিত্র দরবারে প্রবেশ করে। বায়তুল্লাহয় যাও এবং এর চারদিকে হাঁটো এর মালিক ও তাঁর প্রজ্ঞাকে, তাঁর মর্যাদাকে ও তাঁর শক্তিকে প্রশংসা করে। পাথরকে (হাযরে আসওয়াদ) জড়িয়ে ধরো তাঁর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থেকে এবং তাঁর শক্তির সামনে বিনীত হও। তাঁকে ছাড়া সবকিছু পরিত্যাগ করো বিদায়ী তাওয়াফে। তোমার আত্মা ও তোমার অভ্যন্তরীণ সত্তাকে পবিত্র করো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে মোলাকাতের জন্য, যেদিন তুমি তাঁর মোলাকাত লাভ করবে 'সাফা'- তে দাঁড়িয়ে।

মারওয়াহতে নিজের গুণাবলী নিশ্চিহ্ন করে আল্লাহর কাছ থেকে সাহস ও সৌজন্য গ্রহণ করো । তোমার হজ্বের অবস্থাগুলোতে সামঞ্জস্য বজায় রাখো এবং তোমার রবের সাথে যে চুক্তি তুমি

করেছো তা পূরণ করো, যার জন্য তুমি বিচার দিনে তাঁর কাছে দায়বদ্ধ। জেনে রাখো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হজ্বকে বাধ্যতামূলক করেছেন এবং তিনি তাঁর বিষয়ে অন্য সব ইবাদাত থেকে এটিকে বাছাই করেছেন যখন তিনি বলেছেনঃ

(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)

''আল্লাহর জন্য আল্লাহর ঘরে হজ্ব মানব জাতির উপর বাধ্যতামূলক এবং প্রত্যেকের উপরে যারা সেখানে যেতে সক্ষম।'' (সূরা আলে ইমরানঃ ৯৭)

রাসূলুল্লাহ (সা.) হজ্বের আনুষ্ঠানিক কর্মকান্ডগুলোকে সাজিয়েছেন মৃত্যু, কবর, পুনরুত্থান এবং বিচার দিনের প্রস্তুতি ও ইঙ্গিত হিসেবে। মানবজাতির জন্য এ শিক্ষায় তিনি তাদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন – কারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং কারা আগুনে প্রবেশ করবে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হজ্বের আনুষ্ঠানিক কর্মকান্ডগুলিকে সাজিয়ে যাদের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা আছে তাদেরকে দেখিয়ে ।

যাকাত

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য বাধ্যতামূলক দান (যাকাত) তোমার শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ থেকে প্রাপ্য। এমনকি তোমার প্রত্যেক চুলের গোড়া থেকেও। প্রকৃতপক্ষে তোমার জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে যাকাত বাধ্যতামূলক। চোখের যাকাত হলো সহানুভূতিসহ দৃষ্টিপাত এবং কামনা- বাসনার দৃষ্টি ও এ ধরনের জিনিস থেকে চোখকে সরিয়ে রাখা। কানের যাকাত হলো সবচেয়ে ভালো শব্দ শোনা। যেমন প্রজ্ঞা, কোরআন, বিশ্বাসের জন্য লাভজনক বিষয়গুলো, যেমন, সতর্কবানী এবং এর বিপরীতগুলো এড়িয়ে চলা যেমন- মিথ্যা, অপবাদ এবং এরকম জিনিস।

জিহবার যাকাত হলো মুসলমানদের সৎ উপদেশ দেয়া, যারা উদাসীন তাদেরকে জাগ্রত করা, অনেক তাসবীহ এবং যিকর করা এবং এরকম অন্যান্য জিনিস।

হাতের যাকাত হলো অন্যের জন্য টাকা- পয়সা খরচ করা, তোমাকে দেয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নেয়ামতগুলোর বিষয়ে উদার হওয়া, জ্ঞান ও তথ্য লিখে রাখাতে তা ব্যবহার করা যার মাধ্যমে অন্য মুসলমানেরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আনুগত্যে লাভবান হবে এবং একে খারাপ থেকে নিয়ন্ত্রণ করা। পায়ের যাকাত হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি দায়িত্ব পালনে দ্রুত যাওয়া- যেমন, ধার্মিক লোকদের সাক্ষাতে যাওয়া, যিকর- এর সমাবেশে যাওয়া, লোকজনের মাঝে সম্পর্ক ঠিক করে দেয়া, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা, জিহাদে নিয়োজিত হওয়া এবং এমন জিনিস করা যা তোমার অন্তরকে সুস্থ এবং তোমার বিশ্বাসকে শুদ্ধ করবে।

আমরা এখানে কিছু যাকাত- এর পথ উল্লেখ করেছি, যেগুলো অন্তর বুঝতে পারে এবং সত্তা তা সম্পাদন করতে পারে। যদিও আরো অনেক আছে উল্লেখ করার মত যেগুলো আয়ত্বে আনতে পারে শুধু তাঁর মুখলেস ও অত্যন্ত নিকট বান্দাহরা। নিশ্চয়ই তারা যাকাতের নেতা এবং তাদেরই

আছে এ মর্যাদার চিহ্ন। হে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাকে সে জিনিসে সফলতা দিন যা আপনি ভালোবাসেন এবং যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন।

নিয়ত

সে ব্যক্তির নিয়ত বিশুদ্ধ যার আছে সুস্থ অন্তর, কারণ সুস্থ অন্তর নিষিদ্ধ বিষয়ের চিন্তা থেকে মুক্ত। তা আসে সব বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য তোমার নিয়ত করা থেকে।

(يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ)

''সেদিন না সম্পদ না সন্তানাদি কোন কাজে আসবে শুধু সে ছাড়া যে আসবে কদর্যতা মুক্ত অন্তর নিয়ে।'' (সূরা শুয়ারাঃ ৮৮- ৮৯)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ''বিশ্বাসীর নিয়ত তার কাজের চাইতে উত্তম।'' এবং আরো বলেছেনঃ ''কাজ নিয়তের উপরে নির্ভরশীল, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়ত করেছিলো।'' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বান্দাহর তাই অবশ্যই খালেস নিয়ত থাকতে হবে প্রত্যেক ক্রিয়া ও স্থিরতার মুহূর্তে। কারণ সে ক্ষেত্রে সে উদাসীন থাকবে না। যারা উপেক্ষাকারী তারা তিরস্কৃত হয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছেঃ

(إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا)

''তারা গবাদিপশুর মত ছাড়া আর কিছু নয়, না তারা পথ থেকে আরো দূরে সরে যাচ্ছে।'' (সূরা ফুরকানঃ ৪৪)

(أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ)

''এরা হচ্ছে উদাসীন।'' (সূরা আরাফঃ ১৭৯)

নিয়ত আসে অন্তর থেকে জ্ঞানের বিশুদ্ধতা অনুযায়ী। এটি পরিবর্তিত হয় বিশ্বাস পরিবর্তনের সাথে সাথে। বিভিন্ন সময়ে এর শক্তি ও দূর্বলতার তারতম্য হয়। যাদের খালেস নিয়ত রয়েছে তাদের স্বার্থপরতা ও কামনা বাসনা পরাভূত হয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার তাসবীহ করার শক্তি ও তাঁর সামনে বিনয়ের কাছে। সে তার প্রকৃতি, তার ক্ষুধা এবং তার কামনা বাসনার কারণে একটি অসুবিধার মধ্যে আছে তবুও অন্যরা তার কাছে স্বস্তি খুঁজে পায়।

পরিচ্ছেদ- ৭

যিকর

যে সত্যিকারভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে স্মরণ করে সে তাঁকে মেনে চলে। যে ভুলে যায় সে অবাধ্য। আনুগত্য হেদায়েতের চিহ্ন। অবাধ্যতা পথভ্রষ্ঠতার চিহ্ন। এ দুই অবস্থার মূলে রয়েছে যিকর (স্মরণ) এবং ভুলে যাওয়া। তোমার অন্তরকে তোমার জিহবার মনোযোগের কেন্দ্র বানাও – যার নড়াচড়া করা উচিত নয় যদি না অন্তর ইঙ্গিত করে ও বুদ্ধি একমত হয় এবং জিহবা বিশ্বাসের সাথে মিল রাখে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা জানেন তুমি কী লুকাও এবং তুমি কী প্রকাশ কর।

তার মত হও যার আত্মা তার দেহ থেকে ঝরে গেছে অথবা তার মত যে হিসাব দিনের মহাসমাবেশে যোগদান করছে – তাঁর প্রতিশ্রুতি ও তাঁর হুমকি এবং তোমার রব তোমার উপরে যে আদেশ ও নিষেধ জারী করেছেন তা পালন করার ব্যাপারে মনোযোগ না হারিয়ে। নিজেকে নিয়ে বিভোর থেকো না বরং তোমার রব তোমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা নিয়ে ব্যস্ত হও। তোমার অন্তরকে দুঃখ ও ভয়ের পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার যিকরকে তোমার জন্য তাঁর মহান স্মরণের অংশ বানাও। তিনি তোমাকে স্মরণে রাখেন কিন্তু তোমাকে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। তুমি তাকে যে স্মরণ কর তাঁর চাইতে তোমাকে তাঁর স্মরণ আরো মহান, আরো আকর্ষণীয়, আরো প্রশংসনীয় এবং আরো সম্পূর্ণ ও আরো প্রাচীন। তোমাকে তিনি স্মরণ করার কারণে যে জ্ঞান তুমি লাভ কর তা তোমার ভিতরে বিনয়, ভদ্রতা এবং অনুতাপের জন্ম দিবে। পরিণতিতে তা তোমাকে তাঁর উচ্চ মর্যাদা এবং উপচে পড়া পূর্ববর্তী দানসমূহ দেখতে সাহায্য করবে। তা তোমার আনুগত্যকে তোমার চোখেই তুচ্ছ হিসাবে দেখাবে, তাঁর নেয়ামতের কারণে তা যত বড়ই হোক, এবং তুমি তাঁর প্রতি আন্তরিকভাবে আত্মনিয়োগ করবে। কিন্তু তাঁকে তোমার স্মরণ করার বিষয়ে তোমার চেতনা ও সম্মানবোধ তোমাকে লোক

দেখানো, অহংকার, মূর্খতা এবং তোমার চরিত্রের রুক্ষতার দিকে ঠেলে দিবে। এর অর্থ হলো (তার প্রতি) তোমার আনুগত্যকে খুব বেশী মর্যাদা দেয়া অথচ তাঁর উপচে পড়া নেয়ামত ও উদারতাকে ভুলে যাওয়া।

এটি তোমাকে তাঁর কাছ থেকে আরো দূরে সরিয়ে দেবে এবং চলে যেতে থাকা দিনগুলোতে তুমি যা অর্জন করবে তা হবে শুধুই একাকীত্ব। দু'ধরনের যিকর আছেঃ আন্তরিক যিকর যেখানে অন্তর হয় প্রশান্ত এবং সে যিকর যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর স্মরণকে বিতাড়িত করে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ''আপনার যথাযথ প্রশংসা করাতে আমি ন্যায়বিচার করতে অক্ষম যেভাবে আপনি নিজে নিজের প্রশংসা করেছেন।'' রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে স্মরণ করার বিষয়ে কোন সীমানা নির্ধারন করেন নি। যেহেতু তিনি এ সত্য জানতেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বান্দাহ তাঁর যে স্মরণ করে তার চাইতে উত্তম হচ্ছে বান্দাহকে তাঁর স্মরণ। তাই এটি আরো যথাযোগ্য যে যে-ই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরে আসবে সে যেন কোন সীমানা নির্ধারন না করে এবং যে আল্লাহকে স্মরণ করতে চায় তার জানা থাকা উচিত যে যতক্ষণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর বান্দাহকে তাঁর স্মরণ করাতে সফলতা না দিবেন বান্দাহ তাঁকে স্মরণ করতে অক্ষম হবে।

ক্বারীদের ধ্বংস

যে ব্যক্তি জ্ঞান ছাড়া তেলাওয়াত করে সে হচ্ছে সেই দেউলিয়া লোকের মত যার না আছে সম্পত্তি না আছে সম্পদ; কারণ জনগণ কাউকে ঘৃণা করে না সহায়-সম্পত্তি না থাকার কারণে, বরং তারা তাকে ঘৃণা করে তার অহংকার-এর কারণে। সে সবসময় সৃষ্টির সাথে ঐ বিষয়ে দ্বন্দ্বে আছে যা তার উপরে বাধ্যতামূলক নয় এবং যে সৃষ্টির সাথে বিরোধিতায় জড়ায় যে বিষয়ে তাকে আদেশ করা হয় নি সে সৃষ্টি প্রক্রিয়া এবং পরম প্রভুত্বের বিরোধিতায় লিপ্ত আছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

(وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ)

''মানুষের মাঝে সে আছে যে আল্লাহর বিষয়ে তর্ক করে কোন জ্ঞান, কোন হেদায়াত এবং আলোদানকারী কোন কিতাব ছাড়াই।'' (সূরা লুকমানঃ ২০)

কেউ সে ব্যক্তির চাইতে কঠোর শাস্তি পাবে না যে জ্ঞানের চাদরের উপর অধিকার দাবী করে অথচ তার কাছে না আছে সত্য, না আছে এর অর্থ। যাইদ ইবনে সাবিত তার ছেলেকে বলেছিলেনঃ ''হে আমার পুত্র, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যেন তোমার নাম অর্থহীন তেলাওয়াতকারীদের তালিকায় না দেখেন।'' রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ''এমন একটি সময় আমার উম্মতের কাছে আসবে যখন তেলাওয়াতকারীর নাম শোনা অধ্যয়নের চাইতে উত্তম বিবেচিত হবে এবং অধ্যয়ন বিবেচিত হবে অভিজ্ঞতাসহ কাজ করার চাইতে উত্তম... আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মোনাফেক্ব হলো কোরআনের ক্বারীদের মধ্যে।''

সেখানেই থাকো – যেখানে থাকার জন্য তোমার বিশ্বাস তোমাকে পরামর্শ দেয় এবং যেখানে তোমাকে থাকতে আদেশ করা হয়। যতটুকু পারো নিজের ভিতরের অবস্থা অন্যদের কাছে গোপন করো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি তোমার আনুগত্যপূর্ণ কাজগুলোকে এমন বানাও যেমন তোমার আত্মা তোমার দেহের সাথে সম্পর্ক রাখে, যেন সেগুলো হয় তোমার অবস্থার ইঙ্গিত যা তুমি তোমার ও তোমার সৃষ্টিকর্তার মাঝে অর্জন করেছো। তোমার সব বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাহায্য চাও এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করো রাতের শেষে ও দিনের শেষে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)

''তোমাদের রবকে ডাকো বিনয়ের সাথে ও গোপনে, নিশ্চয়ই তিনি সীমালংঘনকারীদের ভালোবাসেন না।'' (সূরা আরাফঃ ৫৫)

সীমালংঘন হচ্ছে আমাদের যুগে ক্বারীদের চরিত্রের একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। তোমার সব বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে ভয় করো। যেন তুমি কামনা- বাসনার কবলে না পড় এবং নিজেকে ধ্বংস করে না ফেলো।

সত্য যাচাই ও মিথ্যা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে ভয় করো এবং তুমি যেখানে এবং যে লোকদের মাঝে চাও – থাকো। যে সতর্কতা অবলম্বন করে তার জন্য পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নেই। সতর্কতা অবলম্বন সব দলের জন্যই কাম্য। এতে রয়েছে সব কল্যাণ ও প্রজ্ঞা। এটি প্রত্যেক গ্রহণযোগ্য আনুগত্যপূর্ণ কাজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাপ। সতর্কতা হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার মারেফাতের ঝর্না থেকে বেরিয়ে আসা পানিঃ জ্ঞানের প্রত্যেক শাখা এর প্রয়োজনে রয়েছে। কীভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভয়ে ও তাঁর শক্তির ভয়ে চলৎশক্তি রহিত হয় তা জানার জন্য কোন সত্যায়নের প্রয়োজন নেই। সতর্কতায় বৃদ্ধি ঘটে তাঁর বান্দাহদের গোপন বিষয়গুলোর সাথে তাঁর গোপন করুণার পরিচয় করিয়ে দেয়ার কারণে। আর এটি তা প্রত্যেক সত্যের মূল।

মিথ্যা হলো যা কিছু তোমাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছ থেকে কেটে দেয়। প্রত্যেক দলই এর সাথে একমত। অতএব মিথ্যা পরিত্যাগ করো – তোমার গোপনকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি নিবদ্ধ করো কোন পিছুটান ছাড়াই।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ''বেদুইনরা সবচেয়ে বেশী সত্য যা বলেছে তা হলো লাবিদের কথা – যখন সে বলেছেঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া সবকিছু মিথ্যা এবং প্রত্যেক নেয়ামত অতি অবশ্যই ক্ষণস্থায়ী।

তাই তা আঁকড়ে ধরে থাকো যে বিষয়ে পবিত্র, ধার্মিক এবং সতর্ক ব্যক্তিরা ঐক্যমত আর তা হলো- বিশ্বাসের মূল, ইয়াক্বীনের বাস্তবতা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টি ও আত্মসমর্পন। জনগণের মাঝে মতভেদ ও বিরোধিতার মাঝে প্রবেশ করো না, কারণ তাহলে তোমার জন্য বিভিন্ন বিষয় কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। বাছাইকৃত উম্মত একমত হয়েছে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এক এবং তাঁর মত কিছু নেই এবং তিনি তাঁর বিচারে ন্যায়পরায়ন, তাই করেন যা তাঁর ইচ্ছা এবং পরিচালনা করেন যা তাঁর সিদ্ধান্ত। তাঁর কোন সৃষ্টিতে কেউ জিজ্ঞেস করে না 'কেন?' । কোন কিছু ছিলো না এবং কোন কিছু হবেও না যা তাঁর সিদ্ধান্ত ও চাওয়া

অনুযায়ী নয়। তাঁর তা করার শক্তি আছে যা তিনি করার সিদ্ধান্ত নেন এবং তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি ও হুমকিতে সত্যবাদী।

কোরআন হচ্ছে তাঁর কথা এবং এর অস্তিত্ব ছিলো জীবিত সত্তা, স্থান ও সময়ের আগে। জীবিত সত্তাগুলোর সৃষ্টি ও সেগুলোর বিলীন হওয়া তাঁর কাছে সমান। তাদের সৃষ্টি তাঁর জ্ঞানের কোন বৃদ্ধি ঘটায় নি এবং তাদের চলে যাওয়া তাঁর রাজ্যে কোন ঘাটতি আনবে না। তাঁর ক্ষমতা পরম এবং তিনি রাজকীয়, সমস্ত মর্যাদা তাঁর।

যদি কেউ তোমার কাছে কিছু আনে যা এ মৌলিক সত্যের চাইতে কম হয় তাহলে তা গ্রহণ করো না। তোমার ভিতরের সত্তাকে এর দিকে নিবদ্ধ করো, তুমি এর নেয়ামতকে কাছেই দেখতে পাবে, তুমি বিজয়ীদের একজন হবে।

রাসূলুল্লাহ (ইরফান) এর আধ্যাত্মিক জ্ঞান -(.সা)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর রাসূলকে (সা.) ও তাঁর পরিবারকে তাঁর লুৎফ (গোপন দয়া), উদারতা এবং রহমত এর ভান্ডার থেকে দান করেছেন। তিনি সেগুলোকে শিক্ষা দিয়েছেন তাঁর জ্ঞান ভান্ডার থেকে এবং সমস্ত সৃষ্টির মাঝ থেকে তাদেরকে নিজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। পুরো সৃষ্টিজগত থেকে কেউ একজনও তাদের অবস্থা ও চরিত্রের অধিকারী নয়, কারণ তিনি তাদেরকে বানিয়েছেন সমস্ত সৃষ্ট প্রাণীদের জন্য তাঁর কাছে আসার মাধ্যম। তিনি তাদের আনুগত্য ও তাদের প্রতি ভালোবাসাকে তাঁর সন্তুষ্টির কারণ এবং তাদের বিরোধিতা এবং তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করাকে তাঁর ক্রোধের কারণ বানিয়েছেন। তিনি সব মানুষ ও দলকে আদেশ দিয়েছেন তাদের রাসূলকে অনুসরণ করার জন্য, তাদের মাধ্যমে আনুগত্য ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমের আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করার জন্য, তাদের প্রশংসা করার জন্য এবং তাদের আদেশ করেছেন তাদের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান প্রদর্শন ও তাদের কাছে আত্মসমর্পণ এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে তাদের উচ্চ মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য।

অতএব সবাই আল্লাহর রাসূলের (তাঁর ও তাঁর পরিবারের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) প্রশংসা করো এবং তাদেরকে তাদের চাইতে নীচে কোন ব্যক্তির সমান মর্যাদা দিয়ো না। তাদের মাক্বাম, আস্থা ও চরিত্র সম্পর্কে তোমার বুদ্ধি খাঁটিয়ো না যদি না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে তা পরিষ্কার তথ্য হয় এবং যাদের অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে তাদের ঐক্যমত হয় সে প্রমাণসমূহের উপরে যেগুলো তাদের মূল্য ও মর্যাদার সাক্ষ্য দেয়। কীভাবে তুমি সেই বাস্তবতা বুঝতে পারবে যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছ থেকে তারা পেয়েছে? যদি তুমি তাদের কথা এবং কাজকে তাদের চাইতে নীচে কোন ব্যক্তির সাথে তুলনা কর তাহলে তুমি তাদের খারাপ সাথী হবে, এবং তুমি অজ্ঞতার কারণে তাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে ও তারা যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কতৃক বিশেষভাবে বাছাইকৃত তা অস্বীকার করবে এবং তুমি বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের স্তর থেকে নীচে পড়ে যাবে। তাই সতর্ক হও এবং আবারও সতর্ক হও।

ইমামদেরকে (আ.) স্বীকৃতি দান

সালমান আল ফারসী থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছেঃ ‘‘আমি রাসূলুল্লাহর (সা.) কাছে উপস্থিত হলাম, তিনি আমার দিকে তাকালেন এবং বললেনঃ ‘হে সালমান, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কোন নবী অথবা রাসূলকে পাঠান না যদি না তার সাথে বারোজন সর্দার থাকে।’ ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তা দুই কিতাব- এর লোকদের কাছ থেকে জেনেছি।’ ‘হে সালমান, তুমি কি আমার বারোজন সর্দারকে চেনো, যাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমার পরে ইমাম হিসাবে নির্বাচন করেছেন?’

‘আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ও তাঁর রাসূল সবচেয়ে ভালো জানেন।’

‘হে সালমান, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাকে সৃষ্টি করেছেন পবিত্রতম আদি নূর থেকে এবং আমাকে ডাকলেন এবং আমি তাঁর আদেশ মানলাম। এরপর তিনি আলীকে (আ.) আমার নূর থেকে সৃষ্টি করলেন এবং তাকে ডাকলেন এবং সে আদেশ মানলো। আমার নূর ও আলীর নূর থেকে তিনি সৃষ্টি করলেন ফাতিমাহকে (আ.); তিনি তাকে ডাকলেন এবং সে আদেশ মানলো। আমার, আলীর ও ফাতিমাহর (আ.) থেকে তিনি সৃষ্টি করলেন আল হাসান ও আল হোসেইনকে (আ.)। তিনি তাদের ডাকলেন এবং তারা তাঁর আদেশ মানলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে তাঁর পাঁচটি নাম থেকে নাম দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হলেন আল মাহমুদ (প্রশংসিত) এবং আমি মুহাম্মাদ (প্রশংসার যোগ্য), আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হলেন আল আলী (উচ্চ) এবং এ হলো আলী (আ.)(যে উচ্চ স্থানীয়), আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হলেন ‘আল ফাতির (যিনি শূন্য থেকে সৃষ্টি করেন) এবং এ হলো ফাতিমাহ (আ.), আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হলেন তিনি যার কাছে আছে হাসান (অন্যের জন্য কল্যাণ) এবং এ হলো হাসান, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হলেন মুহাসসিন (পরম সুন্দর) এবং এ হলো হোসেইন। তিনি নয়জন ইমামকে সৃষ্টি করলেন আল হোসেইন (আ.)- এর নূর থেকে এবং তাদেরকে ডাকলেন এবং তারা তাঁর আদেশ মানলো – আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা উঁচু

আকাশ, বিস্তৃত পৃথিবী, বাতাস, ফেরেশতা ও মানুষ সৃষ্টি করার আগেই আমরা ছিলাম নূর যারা তাঁর প্রশংসা করতো, তাঁর কথা শুনতো এবং তাঁকে মেনে চলতো।'

'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার বাবা ও মা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, ঐ ব্যক্তির জন্য কী আছে যে এ ব্যক্তিদের, সেভাবে স্বীকৃতি দেয় যেভাবে তাদের স্বীকৃতি দেয়া উচিত?'

'হে সালমান, যে- ই তাদের স্বীকৃতি দেয় যেভাবে তাদের স্বীকৃতি দেয়া উচিত এবং তাদের উদাহরণ অনুসরণ করে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে এবং তাদের শত্রুদের কাছ থেকে মুক্ত থাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার শপথ, সে আমাদের একজন। সে সেখানে ফেরত আসবে যেখানে আমরা ফেরত আসবো এবং সে সেখানে থাকবে যেখানে আমরা আছি।'

'ইয়া রাসূলুল্লাহ, তাদের নাম ও বংশধারা না জানা থাকলে কি বিশ্বাস আছে?'

'না, সালমান।'

'হে আল্লাহর রাসূল, আমি তাদের কোথায় পাবো?'

'তুমি ইতিমধ্যেই আল হোসেইনকে (আ.) জানো, এরপর আসবে ইবাদাতকারীদের সর্দার আলী ইবনুল হোসেইন (যায়নুল আবেদীন) (আ.); এরপর তার পুত্র মুহাম্মাদ ইবনে আলী (আ.)- পূর্বের ও পরের নবী ও রাসূলদের জ্ঞান বিদীর্ণকারী (আল বাক্বির); এরপর জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, আল্লাহর সত্যবাদী জিহবা (আল সাদিক্ব); এরপর মূসা ইবনে জাফর, (আ.) যে আল্লাহর জন্য ধৈর্যের মাধ্যমে তার রাগকে নিশ্চুপ রেখেছে (আল কাযিম); এরপর আলী ইবনে মূসা, (আ.) যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার গোপন বিষয়ে সন্তুষ্ট আছে (আল রিদা); এরপর মুহাম্মাদ ইবনে আলী, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সৃষ্টির মাঝ থেকে নির্বাচিত জন (আল মুখতার) ; এরপর আলী ইবনে মুহাম্মাদ, যে আল্লাহর দিকে পথ প্রদর্শক (আল হাদী); এরপর আল হাসান ইবনে আলী (আ.), যে নিশ্চুপ- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার গোপন বিষয়ের আমানতদার (আল আসকারি); এরপর মিম হা মিম দাল (মুহাম্মাদ), যাকে ডাকা হয় ইবনে আল হাসান (আ.)- যে ঘোষক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে।'

সালমান বলেনঃ ‘আমি কাঁদলাম, এরপরে বললামঃ ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার জীবন তাদের সময় পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হোক।’

তিনি বললেনঃ ‘হে সালমান, এটি তেলাওয়াত করোঃ

(فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٥﴾ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا)

‘‘যখন দু’টি প্রতিশ্রুতির প্রথমটি এলো, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে পাঠালাম আমার শক্তিশালী যোদ্ধা বান্দাহদের, আর তারা বাড়িগুলোর ভিতর পর্যন্ত প্রবেশ করলো এবং তা ছিলো একটি প্রতিশ্রুতি, বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য। এরপর আমরা তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করলাম এবং তোমাদেরকে সম্পদ ও সন্তানাদি দিয়ে সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে একটি বড় সংখ্যার দলে পরিণত করলাম।’’ (সূরা বনী ইসরাইলঃ ৫, ৬)

সালমান বললেনঃ ‘আমি অনেক কাঁদলাম, এবং আমার আকাঙ্ক্ষা প্রচন্ড হয়ে দাঁড়ালো। আমি বললামঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটি কি আপনার কাছ থেকে একটি প্রতিশ্রুতি?’

‘হ্যাঁ, তাঁর শপথ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন এবং সংবাদ দিয়েছেন; এটি একটি প্রতিশ্রুতি আমার, আলীর, ফাতিমাহর, আল হাসান , আল হোসেইন এবং আল হোসেইনের বংশ থেকে নয়জন ইমামদের কাছ থেকে তোমার জন্য এবং তাদের জন্য যারা আমাদের সাথে আছে এবং যাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে। যে তার বিশ্বাসে সত্যিকারভাবে আন্তরিক, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার শপথ সালমান, ইবলিস ও তার বাহিনীগুলো আসুক। যার আছে সত্যিকার অবিশ্বাস সে শাস্তি পাবে প্রত্যাঘাত ও নির্যাতন এবং উত্তরাধীকার- এর (অন্যদের দ্বারা) মাধ্যমে। তোমার রব কারো উপরে যুলুম করবেন না। আমাদের কথা এই আয়াতে বলা হয়েছে।

(وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٥﴾ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ)

‘‘আমরা চাইলাম তাদেরকে নেয়ামত দিতে যাদেরকে পৃথিবীতে দূর্বল ভাবা হতো এবং তাদেরকে নেতা বানাতে এবং তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানাতে এবং তাদেরকে যমীনে ক্ষমতা দিতে এবং

ফেরাউন, হামান এবং তাদের বাহিনীগুলোকে দেখাতে যা থেকে তারা ভয় পেতো।'' (সূরা কাসাসঃ ৫, ৬)

সালমান বলেনঃ ‘আমি আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম সম্পূর্ণ ভ্রুক্ষেপহীন হয়ে কীভাবে সালমান মৃত্যুর সাথে দেখা করবে অথবা কীভাবে মৃত্যু তার সাথে দেখা করবে।''

পরিচ্ছেদ- ৮

সাহাবীদের স্বীকৃতি দান

ইয়াক্বিন (নিশ্চিত জ্ঞান) পরিত্যাগ করো না সন্দেহের বদলে এবং যা স্পষ্ট তাও নয় গোপনের বদলে। কোন মন্তব্য করো না সে বিষয়ে যা তুমি দেখতে পাও না সে সম্পর্কে তোমাকে বলার কারণে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ঘৃণা করেন তোমার ভাই সম্পর্কে অপবাদ ও খারাপ ধারণাকে। তাহলে তিনি কী ভাবেন সেই দুঃসাহস সম্পর্কে যা- রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর সাহাবীদের সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ, মিথ্যা বিশ্বাস অথবা মিথ্যা কথা আরোপ করে?।

তিনি বলেছেনঃ

(إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ)

‘‘যখন তোমরা একে স্বাগত জানিয়েছো তোমাদের জিহবা দিয়ে এবং মুখে বলেছো যার বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান ছিলো না এবং তোমরা একে একটি সহজ বিষয় ভেবেছো অথচ আল্লাহর কাছে তা ছিলো অত্যন্ত ঘৃণ্য।’’ (সূরা নূরঃ ১৫)

যতক্ষণ তুমি লোকদের সম্পর্কে ভালো কথা বলার এবং কাজ করার সুযোগ পাও – তারা ভালো হোক বা না হোক – তাহলে আর কিছু করো না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا)

‘‘লোকদেরকে ভালো কথা বলো।’’ (সূরা বাকারাঃ ৮৩)

জেনে রাখো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর রাসূলের (সা.) জন্য সাহাবীদের নির্বাচন করেছেন, তাদেরকে সবচেয়ে সম্মানিত করেছেন এবং তাদেরকে সমর্থন, বিজয় ও কাঙ্ক্ষিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে তার সাথে সঠিক সাহচর্যের পোষাক পরিয়েছিলেন। তিনি তার রাসূল (সা.)- এর জীহবা দিয়ে তাদের মর্যাদা, উন্নত গুণাবলী এবং সম্মানের কথা প্রকাশ করেছেন;

তাই বিশ্বাস করো তাদের ভালোবাসায়, উল্লেখ করো তাদের উচ্চ সম্মান এবং বেদাত সৃষ্টিকারী লোকদের সাহচর্য থেকে সাবধান থাকো, কারণ তা অবিশ্বাস ও অন্তরে পরিষ্কার ক্ষতির সৃষ্টি করবে। যদি তাদের কারো কারো মর্যাদার বিষয় তোমার কাছে স্পষ্ট না থাকে তাহলে তা অদৃশ্য সম্পর্কে যার জ্ঞান আছে তাঁর কাছে ছেড়ে দাও এবং বলোঃ ''ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা, আমি, সে ব্যক্তিকে ভালোবাসি যাকে তুমি ও তোমার রাসূল ভালোবাসো এবং আমি তাকে ঘৃণা করি যাকে তুমি ও তোমার রাসূল ঘৃণা কর।'' এরপরে আর কোন দায়িত্ব নেই।

বিশ্বাসীদের সম্মান ও মর্যাদা

কেউ বিশ্বাসীদের সম্মান রক্ষা করে না সে ছাড়া যে বিশ্বাসীদের উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পবিত্র দাবীকে সম্মান করে। সেই ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ও তাঁর রাসূলের পবিত্র দাবীকে সম্মান করে যে ব্যক্তি বিশ্বাসীদের সম্মানের দাবীকে রক্ষা করে, বিশেষ যত্নবান থাকে। যে ব্যক্তি বিশ্বাসীদের সম্মানকে ছোট করে দেখে সে তার বিশ্বাসের পোষাককে ছিঁড়ে ফেলেছে।

রাসূল (সা.) বলেছেনঃ ''আল্লাহর প্রতি সম্মান দেখানোর একটি অংশ হচ্ছে যারা বিশ্বাসে আললাহর নিকটবর্তী তাদের প্রতি সম্মান দেখানো'' এবং আরো বলেছেনঃ ''যে ব্যক্তি কম বয়সীদের প্রতি ক্ষমাশীল নয় এবং বয়স্কদের প্রতি সম্মান দেখায় না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কোন মুসলমানকে কাফের বলো না যখন তওবা তা পূরণ করতে পারে, যদি না সে সেই ব্যক্তি হয় যার কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন।''

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ)

''মুনাফেকরা আগুনের সর্বনিম্নস্তরে আছে।'' (সূরা নিসাঃ ১৪৫)

নিজেকে তোমার বিষয়ে ব্যস্ত রাখো যে বিষয়ে তোমাকে প্রশ্ন করা হবে।

পিতা- মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন

পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ববোধ আসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সম্পর্কে বান্দাহর সঠিক জ্ঞান থেকে, যেহেতু অন্য কোন ইবাদাত নেই যা ব্যক্তিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে দ্রুত আনবে বিশ্বাসী পিতা- মাতার প্রতি আল্লাহর জন্য দায়িত্ব পালনের চাইতে। তা এজন্য যে পিতা- মাতার অধিকার এসেছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অধিকার থেকে, যদি তারা উভয়ে ঈমান ও সুন্নাহর উপরে থাকে এবং সন্তানকে তাদের আনুগত্যের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আনুগত্য করাতে বাধা না দেয় অথবা তাকে সরিয়ে না দেয় নিশ্চিত জ্ঞান থেকে সন্দেহে, বিরত থাকা হতে পৃথিবীর আশা আকাঙ্ক্ষা গুলোর দিকে অথবা তাকে আহবান করে সেদিকে যা ঈমান ও সুন্নাহর বিরোধী। যদি পরিস্থিতি এরকম হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হলো আনুগত্য এবং তাদের আনুগত্য হলো বিদ্রোহ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ)

‘‘যদি তারা তোমার সাথে তর্ক করে যেন তুমি আমার সাথে শরীক কর যার কোন জ্ঞান তোমার নেই, তাদেরকে মেনো না। তাদের সাথে এ পৃথিবীতে দয়াপূর্ণ সাহচর্য রাখো, এবং তার পথ অনুসরণ করো যে আমার দিকে ফিরে, এরপরে আমার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন...।’’ (সূরা লুকমানঃ ১৫)

তাদের সাথে সাহচর্যের বিষয়ে – তাদের পাশে থাকো এবং তাদের প্রতি নম্র হও। তাদের বোঝা বহন করো যেভাবে তারা তোমার বোঝা বহন করেছে যখন তুমি শিশু ছিলে এবং তাদেরকে দেয়া থেকে বিরত থেকো না যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তোমাকে প্রচুর দিয়েছেন, খাবার ও পোষাকের বিষয়ে। তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না এবং তাদের কণ্ঠস্বরের উপর তোমার কণ্ঠস্বর উঁচু করো না। তাদের সম্মান করা আল্লাহর একটি আদেশ; তাদের সাথে সবচেয়ে

ভালোভাবে কথা বলো এবং তাদের প্রতি দয়ালু হও। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের পুরস্কার নষ্ট হতে দেবেন না যারা ভালো কাজ করে।

পরিচ্ছেদ- ৯

বিনয়

বিনয় প্রত্যেক মর্যাদাপূর্ণ আসন ও উচ্চ স্থানকে জড়িয়ে ধরে। যদি বিনয়- এর কোন ভাষা থাকতো যা মানুষ বুঝতে পারতো তাহলে তা বিভিন্ন বিষয়ের ফলাফলের ভিতরে লুকিয়ে থাকা বাস্তবতা সম্পর্কে বলতো। বিনয় হলো যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পথে করা হয়। এছাড়া আর যা আছে সব প্রতারণা। যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি বিনয়ী, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে তাঁর অনেক বান্দাহ্র উপরে স্থান দিবেন। বিনয়সম্পন্ন লোকদের চেনার মত অনেক নিদর্শন রয়েছে। যখন তাদের একজনকে বিনয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো সে বললোঃ এর অর্থ তুমি সত্যের প্রতি বিনয়ী হও এবং তা অনুসরণ কর, যদি তা তুমি কোন শিশুর কাছ থেকেও শোন।'' অনেক ধরনের অহংকার জ্ঞানকে ব্যবহার, গ্রহণ ও অনুসরণ করাতে বাধা দেয়। এ সম্পর্কে কিছু আয়াত আছে যেখানে দাম্ভিকদের নিন্দা করা হয়েছে। বিনয়সম্পন্ন লোকদের নিদর্শন রয়েছে যা আকাশের ফেরেশতারা ও পৃথিবীর ইরফানি (আধ্যাত্মিক) ব্যক্তিরা দেখে চিনতে পারে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ)

''সবচেয়ে উঁচু স্থানগুলোতে থাকবে ঐসব মানুষেরা যারা সবাইকে জানবে তাদের চিহ্ন দেখে।'' (সূরা আরাফঃ ৪৬)

এবং অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ)

''যে কেউ তোমাদের মধ্য থেকে তার বিশ্বাস থেকে ঘুরে যায়, তাহলে আল্লাহ এক গোষ্ঠিকে আনবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসে, বিশ্বাসীদের প্রতি বিনয়ী এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠিন।'' (সূরা মায়িদাঃ ৫৪)

(إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)

''নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সতর্ক (মুত্তাক্বী)।'' (সূরা হুজুরাতঃ ১৩)

(فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ)

''তোমাদের নিজেদের আত্মাকে পবিত্র বলো না।'' (সূরা নাজমঃ ৩২)

বিনয়ের মূল আসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার মহাসম্মান, ভয় এবং বিরাটত্ব অনুভব করা থেকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কোন ইবাদাতে সন্তুষ্ট নন এবং তা গ্রহণ করেন না যদি না তা বিনয়ের সাথে আসে। বিনয়ের সত্যিকার অর্থ কেউ জানে না শুধু তারা ছাড়া যারা তাঁর নিকটবর্তী ও তাঁর একত্বের সাথে যুক্ত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا)

''দয়ালু খোদার বান্দাহ হলো তারা যারা যমীনে হাঁটে বিনয়ের সাথে এবং যখন মুর্খরা তাদেরকে সম্বোধন করে তারা বলেঃ সালাম।'' (সূরা ফুরকানঃ ৬৩)

তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিধর এবং এর জনগণের অভিভাবক মুহাম্মাদকে বিনয়ী হতে বলেছেন এই বলেঃ

(وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ)

''বিশ্বাসীদের প্রতি বিনম্র হও।'' (সূরা হিজরঃ ৮৮)

বিনয় থেকে জন্ম নেয় আত্মসমর্পণ, নম্রতা, ভয় ও ভদ্রতা; এ গুণগুলো শুধু বিনয়ের ভেতর থেকেই প্রকাশ পায়। সত্যিকার ও পরিপূর্ণ মর্যাদা শুধু তাদেরকেই দেয়া হয় যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পরম সত্তার প্রতি বিনীত।

মুর্খতা

মুর্খতা হলো একটি আকার যার গঠন প্রকৃতি পৃথিবীর গঠন প্রকৃতির মত। যখন তা সামনে এগিয়ে যায় তখন অন্ধকার দেখা দেয় এবং যখন তা পিছনে সরে আসে তখন আলো দেখা দেয়। আল্লাহর বান্দাহ-র সাথে একবার এদিক আরেকবার ওদিক করে, যেভাবে সূর্যের সাথে সাথে ছায়া একবার এদিক একবার ওদিক করে। তুমি কি মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখ নি? কোন কোন সময় তুমি দেখো যে, সে নিজের গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ এবং সেগুলোর প্রশংসা করছে অথচ একই সময়ে সে অন্যের ভেতরে এগুলোর ভুল বের করছে এবং সেগুলোর সমালোচনা করছে। অন্য সময়ে দেখতে পাও যে, কোন ব্যক্তি তার নিজের প্রকৃতি জানে এবং এর সমালোচনা করছে এবং অন্যের ভেতরে এগুলোকে প্রশংসা করছে। সে নিরাপত্তা ও হতাশার ভিতর দুলে। যদি সে সততা ও নিরাপত্তা পায় সে ঠিক থাকে। আর যদি সে সাহয্যের অভাব দেখে এবং তাকে ছেড়ে যাওয়া হয় তাহলে সে ভুল করে। মুর্খতার চাবি হচ্ছে নিজ জ্ঞানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং এর উপরে পূর্ণ আস্থা রাখা। জ্ঞানের চাবি হচ্ছে এক স্তরের জ্ঞানের সাথে উচ্চতর স্তরের জ্ঞান বিনিময় করা ঐশী অনুগ্রহ ও পথ নির্দেশসহ। একজন মুর্খ ব্যক্তির সর্বনিম্ন গুণ হচ্ছে সে জ্ঞানের দাবী করে যা সে পাওয়ার যোগ্য নয়। তার সবচেয়ে সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার অজ্ঞতা সম্পর্কে তার অজ্ঞতা এবং তার মুর্খতার চরম দিকটি হলো সে জ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করে। সব মুর্খ লোক একই ধরনের।

খাদ্য গ্রহণ

অল্প খাবার সব মানুষের জন্যই সব ক্ষেত্রে প্রশংসনীয়, কারণ তা বাইরের ও ভেতরের সত্তার জন্য কল্যাণকর। খাওয়া তখন প্রশংসনীয় যখন তা করা হয় প্রয়োজনের কারণে, রিযক্ব-এর একটি মাধ্যম হিসাবে, যখন প্রচুর আছে অথবা পুষ্টির জন্য। প্রয়োজনে খাওয়া হলো বিশুদ্ধদের জন্য। খাওয়া একটি মাধ্যম ও মুত্তাক্বীদের জন্য রিযক্ব হলো সাহায্য। প্রচুর আছে এমন সময়ে

খাওয়া হলো তাদের জন্য যারা আস্থা (তাওয়াক্কুল) রাখে এবং পুষ্টির জন্য খাওয়া হলো বিশ্বাসীদের জন্য।

বিশ্বাসীদের অন্তরের জন্য প্রচুর খাওয়ার চাইতে আর কোন কিছু ক্ষতিকর নেই, কারণ তা দু'টো জিনিস ঘটায় – অন্তর কঠিন হয়ে যায় এবং কামনা বাসনার উত্থান ঘটায়। ক্ষুধা বিশ্বাসীদের জন্য স্বাদ বৃদ্ধিকারী, রুহের পুষ্টি, অন্তরের জন্য খাবার এবং দেহের জন্য স্বাস্থ্য। রাসূল (সা.) বলেছেনঃ ''আদমের সন্তান তার পেটের চাইতে খারাপ কোন পাতিল ভরে না।''

দাউদ (আ.) বলেছেনঃ ''এক লোকমা খাবার যা আমার প্রয়োজন তা রেখে দেয়া বিশ রাত জেগে থাকার চেয়ে আমার কাছে বেশী পছন্দনীয়।''

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ''বিশ্বাসী খায় একটি পাকস্থলী ভরার জন্য এবং মোনাফেক্ব খায় সাতটি (পাকস্থলী) ভরার জন্য।'' এবং অন্য জায়গায় বলেছেনঃ ''দুর্ভোগ সে লোকদের জন্য যার দু'জায়গায় ফুলে- যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো সেগুলো কী? তিনি বলেছেনঃ ''পাকস্থলী ও যৌনাঙ্গ।'' ঈসা (আ.) বলেছেনঃ ''অন্তর- এর জন্য কাঠিন্যের চাইতে খারাপ রোগ আর নেই এবং কোন আত্মা আর কোন কারণে বেশী দুর্বল হয়ে যায় নি যা ক্ষুধার অভাবে ঘটেছে, এ দু'টো হলো বহিষ্কৃত হওয়া ও হতাশ হওয়ার দু' চালক।''

শয়তানী কুমন্ত্রণা (ওয়াসওয়াসা)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বান্দাহদের উপর শয়তান নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে যখন তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার স্মরণ পরিত্যাগ করে, দাম্ভিক হয়ে যায় এবং তাঁর হারামের সম্মুখীন হলে নির্বিকার থাকে এবং ভুলে যায় যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের গোপন বিষয়গুলো দেখছেন।

কুমন্ত্রণা আসে অন্তরের বাইরে থেকে বুদ্ধির পরোক্ষ অনুমতিক্রমে এবং একে টিকিয়ে রাখে মানুষের নিজের প্রকৃতি; যখন তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন ভুল, পথভ্রষ্ঠতা ও অবিশ্বাস দেখা দেয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর বান্দাহদের নিঃশব্দে ডেকেছেন এবং তাদেরকে ইবলিস- এর শত্রুতা সম্পর্কে বলেছেনঃ

(إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا)

''শয়তান তোমাদের শত্রু, তাই তাকে শত্রু হিসাবে নাও।'' (সূরা ফাতিরঃ ৬)

তার সাথে সে ব্যক্তির মত হও যে রাখালের কুকুরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে এবং কুকুর- এর মালিককে তার কাছ থেকে কুকুর সরিয়ে নেয়ার জন্য অনুরোধ করছে। বিষয়টি এরকমই যখন শয়তান তোমার কাছে কুমন্ত্রণা দিতে আসে তোমাকে সত্য পথ থেকে সরিয়ে নিতে এবং তোমাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার স্মরণ ভুলিয়ে দিতে।

তখন তার কাছ থেকে আশ্রয় চাও তোমার রব ও তার রবের কাছে। তিনি সত্যকে মিথ্যার বিরুদ্ধে রক্ষা করবেন এবং যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে তাকে সাহায্য করবেন, যেহেতু তিনি বলেনঃ

(إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)

''নিশ্চয়ই তার কোন ক্ষমতা নেই তাদের উপর যারা বিশ্বাস করে এবং তাদের রবের উপর নির্ভর করে।'' (সূরা নাহলঃ ৯৯)

মানুষ তখনই শুধু তা করতে পারবে যখন সে জানে কীভাবে সে আসে এবং জানে তার কুমন্ত্রণার পদ্ধতি কী- সার্বক্ষণিক সতর্কতা, খেদমতে আন্তরিকতা, সর্ব- সচেতন আল্লাহ্‌র ভয় ও তাঁর বেশী বেশী স্মরণের মাধ্যমে।

আর যে ব্যক্তি সচেতন প্রহরায় তার সময় ব্যয় করতে অবহেলা করে সন্দেহতীতভাবে সে শয়তানের শিকারে পরিণত হবে। শয়তান ব্যক্তির নফস নিয়ে যা করে তা থেকে তার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিতঃ সে একে পথভ্রষ্টতা, ধোঁকা এবং দাম্ভিকতার দিকে নিয়ে যায়; ঐ ব্যক্তিকে ধোঁকার মাধ্যমে তার নিজের কাজকর্ম, তার ইবাদাত এবং তার অর্ন্তদৃষ্টিকে তার কাছে প্রশংসনীয় করে তোলে।

তার প্রতি শয়তানের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের কারণে একটি অভিশাপ নেমে আসে তার জ্ঞান, তার ইরফান (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) এবং তার যুক্তিবুদ্ধির ক্ষমতার উপর চিরকালের জন্য। অথচ যারা অবহেলা করে না তাদের উপর তার কোন ক্ষমতা নেই । তাই আল্লাহ্‌র দৃঢ়তম দড়ি ধরো, যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে আশ্রয় চাওয়া এবং প্রত্যেক শ্বাসের সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পূর্ণ প্রয়োজন অনুভব করা। প্রতারিত হয়ো না যখন শয়তান তোমার আনুগত্যের কাজকর্মগুলোকে তোমার চোখে সুন্দর করে দেখায়; যদি সে তোমার কাছে কল্যাণের নিরানববইটি দরজা খুলে ধরে তা শুধু এজন্যই যে সে যেন তোমাকে পরাভূত করতে পারে একশতম দরজাটি খুলে ধরে। তাই তার মোকাবিলা করো বিরোধিতার মাধ্যমে, তার পথকে আটকে দাও এবং তার লোভ দেখানোকে প্রত্যাখ্যান করো।

পরিচ্ছেদ- ১০

গর্ব

গর্ব বিষয়টি অহমিকার সব দিক জড়িয়ে ধরে আছে, এগুলো তাদের মধ্যে পাওয়া যায় যারা তাদের কাজ কর্ম নিয়ে গর্ব করে, তাদের শেষ পরিণতি কী হবে তা সম্পর্কে খুব কমই জেনে। যে- ই নিজেকে নিয়ে গর্ব করে তার কাজ সত্য পথ থেকে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সে তাই দাবী করে যা তার নয়।

কোন ব্যক্তি যদি কোন কিছু দাবী করে যাতে তার অধিকার নেই সে একজন মিথ্যাবাদী, যদি এমনও হয় যে সে দীর্ঘদিন তার দাবী গোপন রাখে। গর্বকারী ব্যক্তির বেলায় যা প্রথমে ঘটে তা হলো তার গর্বের বিষয়টি তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয় যেন সে জানতে পারে সে ঘৃণিত এবং অক্ষম; আর সে নিজের বিরুদ্ধেই নিজে সাক্ষী দিবে এবং তা হবে তার বিরুদ্ধে দৃঢ়তর প্রমাণ। এটি ঘটেছিলো ইবলিসের বেলায়।

গর্ব একটি গাছ যার বীজ হলো অবিশ্বাস, যার মাটি হলো মোনাফেকি এবং এর পানি হচ্ছে সীমালংঘন। এর শাখাগুলো হলো অজ্ঞতা, এর পাতাগুলো হলো ভুলপথ এবং এর ফল হলো আগুনে চিরদিন থাকার অভিশাপ। যে গর্ব পছন্দ করলো সে অবিশ্বাসের বীজ বুনলো এবং মোনাফেক্বী চাষ করলো। অবশ্যম্ভাবী যে এটি ফল দিবে এবং শেষ পর্যন্ত সে আগুনের ভেতর পড়বে।

উদারতা

উদারতা হলো রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর প্রকৃতির একটি অংশ এবং বিশ্বাসের খুঁটি। একজন ব্যক্তি বিশ্বাসী হতে পারে না যদি না সে উদার হয়। অবশ্যই আরো যা থাকতে হবে তা হলো নিশ্চিত বিশ্বাস (ইয়াক্বীন) এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা (হিম্মাহ), কারণ উদারতা হলো ইয়াক্বীন- এর একটি রশ্মি। প্রচেষ্টা তার জন্য সহজ যে তার উদ্দেশ্য জানে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ''আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বন্ধু প্রকৃতিগতভাবেই উদার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে প্রিয় প্রত্যেক ব্যক্তিকে উদারতা দান করা হয়েছে যাদের এ পৃথিবী থেকে সামান্য আছে । উদারতার একটি নিদর্শন হচ্ছে এ পৃথিবীর সম্পদ এবং কে এর মালিক, বিশ্বাসী অথবা অবিশ্বাসী, অনুগত অথবা বিদ্রোহী এবং উচ্চ মর্যাদার বা নিম্ন শ্রেণীর এসব সম্পর্কে আগ্রহের অভাব। উদার ব্যক্তি অন্যদের খাওয়ায় যখন সে নিজে ক্ষুধার্ত থাকে, সে অন্যদের পোষাক দান করে যখন সে নিজে খালি গা থাকে, সে অন্যদের দেয় অথচ সে অন্যদের থেকে উপহার নিতে অস্বীকার করে। সে এর মাধ্যমে উপকৃত হয় এবং তার উদারতার মাধ্যমে সে অন্যদের ঋণী করে না। যদি সে সমস্ত পৃথিবীর মালিক হতো সে নিজেকে এর ভেতরে একজন বিদেশী হিসেবে দেখতো। যদি সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য এক ঘন্টার ভেতর এর পুরোটাই ব্যয় করে ফেলতো তবুও তা তার জন্য আফসোসের কারণ হতো না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ''উদার ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নিকটবর্তী, জনগণের নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী এবং আগুন থেকে অনেক দূরে। অন্যদিকে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছ থেকে দূরে, জনগণের কাছ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে এবং আগুনের কাছে। একমাত্র ঐ ব্যক্তিকে উদার বলা যায় যে নিজেকে ব্যয় করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে জানতে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্যে, যদি এমনও হয় তা একটি রুটি ও পানির মাধ্যমে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেনঃ ‘‘যে ব্যক্তি উদার সে উদার ঐ বিষয়ে যার মালিক সে নিজে এবং এর মাধ্যমে সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার চেহারা (পূর্ণ দৃষ্টি) আশা করে। আর যে ব্যক্তি উদার হওয়ার ভান করে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার শাস্তি এবং ক্রোধ লাভকারী। সে সব মানুষের মধ্যে নিজের প্রতি সবচেয়ে কৃপণ, তাই অন্যদের প্রতি সে কেমন হবে, যখন সে তার নিজের কামনা বাসনার অনুসরণ করে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আদেশের বিরোধিতা করে?, যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ)

‘‘অতি অবশ্যই তারা বহন করবে তাদের নিজেদের বোঝা এবং অন্য বোঝাগুলোও তাদের নিজেদের বোঝার সাথে।’’ (সূরা আনকাবুতঃ ১৩)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ‘‘আদমের সন্তান চীৎকার করে বলে, ‘‘আমার সম্পত্তি! আমার সম্পত্তি! আমার সম্পদ! আমার সম্পদ!’’ হে হতভাগা, কোথায় ছিলে তুমি যখন ছিলো সাম্রাজ্য অথচ তোমার অস্তিত্ব ছিলো না? তুমি যা খাও ও পান কর অথবা যে পোষাক তুমি পড় ও তা ব্যবহারের মাধ্যমে ছিঁড়ে শেষ কর অথবা যা তুমি দান কর এবং যা তুমি টিকিয়ে রাখ তার চেয়ে বেশী কিছু কি আছে?’ হয় তোমাকে এর মাধ্যমে দয়া করা হচ্ছে অথবা তোমাকে এর জন্য শাস্তি দেয়া হবে। অতএব তোমার বুদ্ধি ব্যবহার করো এবং বুঝে নাও যে তোমার জন্য উচিত নয় নিজের সম্পত্তির চাইতে অন্যের সম্পত্তি বেশী ভালোবাসা।

বিশ্বাসীদের আমীর ইমাম আলী (আ.) বলেছেনঃ ‘‘তুমি ইতোমধ্যে যা দিয়েছো তা তাদের জন্য নিদিষ্ট ছিলো যারা এখন তার মালিক; তুমি যা ধরে রেখেছো তা হলো তাদের জন্য যারা এর উত্তরাধিকারী হবে এবং তোমার এখন যা আছে এর উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই শুধু এর কারণে দাম্ভিক হওয়া ছাড়া। কত চেষ্টাইনা তুমি কর এ পৃথিবী পাওয়ার জন্য, কৃতিত্ব দাবী করার জন্য! তুমি কি চাও নিজেকে দরিদ্র করতে এবং অন্যদের ধনী করতে?’’

নিজের হিসাব নেয়া

যদি কোন ব্যক্তিকে তার নিজের হিসাব নিতে কোন কিছুই বাধ্য না করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সামনে উপস্থিত হওয়ার লজ্জা এবং গোপন বিষয়গুলোর উপর থেকে পর্দা ছিঁড়ে নেয়ার বেইযযতি ছাড়া, তাহলে মানুষ পাহাড়ের চুড়া থেকে নিজেকে নীচে ফেলে দিতো এবং কোন বাড়িতে আশ্রয় নিতো না, সে খেতোও না পানও করতো না এবং ঘুমাতোও না শুধুমাত্র নিজের জীবন বাঁচানোর প্রয়োজন ছাড়া। এরকম আচরণই করে মানুষ প্রত্যেক শ্বাস গ্রহণের সাথে যখন সে কিয়ামত (পুনরুত্থান) দেখতে পায় এর আতংক ও দুঃখ- কষ্টসহ। সে তার অন্তরের ভিতরে সে সময়টিকে দেখতে পায় যখন সর্ব- বাধ্যকারী খোদার সামনে সে দাঁড়াবে এবং যখন সে নিজের হিসাব নেয় তখন সে যেন দেখতে পায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সামনে তাকে ডাকা হয়েছে উপস্থাপনের জন্য এবং তাকে যেন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ)

''যদি সরিষা দানার ওজনেও হয়, তাও আমরা উপস্থিত করবো এবং আমরা হিসাব নেয়ার জন্য যথেষ্ট।'' (সূরা আম্বিয়াঃ ৪৭)

ইমামদের একজন (আ.) বলেছেনঃ ''নিজের হিসাব নাও তোমাকে হিসাব দেয়ার জন্য ডাকার আগেই। তোমার কাজকর্মকে তোমার লজ্জা পাওয়ার ভয়ের দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো, তোমার জন্য তা ওজন করার আগেই।''

আবু যার বলেছেনঃ ''জান্নাতের উল্লেখ হচ্ছে মৃত্যু এবং জাহান্নামের আগুনের উল্লেখ করাতেও তাই। কী আশ্চর্য যে একজন ব্যক্তির সত্তা বাস করে দুটি মৃত্যুর মাঝে।''

বর্ণিত আছে ইয়াহইয়া (আ.) পুরো রাত ভাবতেন জান্নাত ও জাহান্নাম নিয়ে, এতে তার রাত কাটতো জাগ্রত অবস্থায় এবং তিনি ঘুমাতেন না। এরপর সকাল বেলায় তিনি বলতেনঃ ''হে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা, মানুষ কোথায় পালাবে? কোথায় মানুষ থাকতে পারে? হে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা, মানুষ পালাতে পারে শুধু তোমার কাছে।''

পরিচ্ছেদ- ১১

নামাজের দরজা খোলা

যখন তুমি ক্বিবলামুখী হও তোমার উচিত এ পৃথিবী থেকে, এর ভেতরে যেসব সৃষ্টি আছে এবং অন্যরা যা নিয়ে ব্যস্ত আছে তা থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া। তোমার অন্তর থেকে সব চিন্তা ভাবনা দূর করে দাও যা তোমাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি অমনোযোগী করে তুলতে পারে। আল্লাহর বিশালত্বকে দেখো তোমার গভীরতম সত্তা দিয়ে এবং স্মরণ রাখো যে তুমি তাঁর সামনে দাঁড়াবে। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ)

''সেখানে প্রত্যেক সত্তা পরিচিত হবে তার সাথে যা সে আগে পাঠিয়েছে এবং তাদেরকে আল্লাহর কাছে ফেরত আনা হবে যিনি তাদের প্রকৃত পৃষ্ঠপোষক।'' (সূরা ইউনুসঃ ৩০)

ভয় ও আশার গোড়াতে দাঁড়াও। যখন তুমি তাকবীর বল তোমার উচিত উচ্চ আকাশগুলো ও ভেজা পৃথিবীর মাঝে যা আছে তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা, যার সবই তাঁর মর্যাদার নীচে। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর বান্দাহর অন্তরের দিকে তাকান যখন সে তাকবীর বলছে এবং দেখেন যে তার অন্তরে কিছু একটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণার সত্যতাকে বাধা দিচ্ছে তখন তিনি বলেন, ''হে মিথ্যাবাদী! তুমি কি আমাকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করছো? আমার শক্তি ও মর্যাদার শপথ, আমি তোমাকে আমার স্মরণের মিষ্টতা থেকে বঞ্চিত করবো এবং আমি আমার নৈকট্য থেকে এবং আমার সাথে ঘনিষ্ট মিলনের আনন্দ থেকে তোমাকে পর্দার মাধ্যমে দূরে সরিয়ে রাখবো।''

জেনে রাখো যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে তোমার খেদমতের কোন প্রয়োজন নেই। তুমি, তোমার ইবাদাত ও তোমার প্রার্থনার তিনি মুখাপেক্ষী নন । তিনি তোমাকে ডাকেন তাঁর নেয়ামত দিয়ে তোমার প্রতি রহমত করার জন্য, তোমাকে তাঁর শাস্তি থেকে দূরে সরিয়ে

রাখার জন্য, তোমাকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করার জন্য এবং তোমার জন্য তাঁর ক্ষমার দরজা খুলে দেয়ার জন্য। যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বিশ্বজগতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা বহুবার সৃষ্টি করতেন, চিরকালব্যাপী, কোন শেষ ছাড়া, আর যদি তারা তাকে সবাই প্রথ্যাখ্যান করতো অথবা তাঁর সাথে ঐক্যবদ্ধ হতো তবুও আল্লাহর জন্য তা একই হতো । প্রাণীকূলের ইবাদাত থেকে তাঁর কাছে যা আছে তা হলো তাঁর উদারতা এবং শক্তির প্রদর্শনী। অতএব নম্রতাকে বানাও তোমার পোষাক এবং অক্ষমতাকে বানাও তোমার গায়ের চাদর। প্রবেশ করো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ক্ষমতার আরশের নীচে, তাহলে তুমি তাঁর প্রভুত্বের কল্যাণ লাভ করতে পারবে – তাঁর কাছে সাহায্য ও তাঁর কাছে আশ্রয় চেয়ে।

নামাজে রুকু

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বান্দাহ যখন সত্যিকারভাবে মাথা ঝোঁকায় (রুকু করে) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে তাঁর ঔজ্জ্বল্যের আলো দিয়ে তাকে সাজান, তাকে ছায়া দেন তার মহত্ত্বের ছায়াতলে এবং তাকে পোষাক পরান তাঁর পবিত্রতার পোষাক দিয়ে। রুকু হলো প্রথম এবং সিজদা দ্বিতীয়। রুকুতে আছে সৌজন্য এবং সিজদাতে আছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নৈকট্য। যে সৌজন্যে ভালো নয় সে নৈকট্যের যোগ্য নয়; অতএব 'রুকু'র মাধ্যমে মাথা ঝোঁকাও তার মত যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি বিনীত, অন্তরে মর্যাদাশূন্য এবং তাঁর ক্ষমতার অধীনে ভীত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো আল্লাহর প্রতি সমর্পিত তার মত যে ভীত ও দুঃখিত এজন্য যে সে হয়তো যারা রুকু করে তাদের মত কল্যাণ পেতে ব্যর্থ হবে ।

বর্ণিত আছে রাবি ইবনে কুসাইম এক রুকুতে সারা রাত জাগতো সকাল পর্যন্ত। সকালে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতোঃ ''হায়, মুখলেস ব্যক্তিরা সামনে চলে গেছে এবং আমরা বাদ পড়ে গেছি।'' তোমার রুকু শুদ্ধ করো পিঠ সোজা রেখে, দাঁড়ানো অবস্থায় তোমার উচ্চাশা থেকে তাঁর দাসত্ব করার জন্য নীচে নেমে এসে যা শুধু তাঁর সাহায্যের মাধ্যমেই ঘটে। তোমার অন্তর পালিয়ে আসুক শয়তানের কুমন্ত্রণা, ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা

তাঁর বান্দাহদেরকে উঁচুতে উঠাবেন তাঁর প্রতি তাদের বিনয় অনুযায়ী এবং তাদেরকে পরিচালিত করবেন বিনয়, আত্মসমর্পণ ও মর্যাদাশূন্যতার শিকড়ের দিকে তাঁর বিশালত্বের সাথে তাদের গভীরতম সত্তার পরিচিতির গভীরতা অনুযায়ী।

নামাজে সিজদা

যে ব্যক্তি সত্যিকার সিজদা করে সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে কোনভাবেই হারায় না, এমনও যদি হয় যে সে তা একবার করেছে তার সারা জীবনে; কিন্তু যে ব্যক্তি তার রবকে ঐ অবস্থায় (সিজদায়) ছেড়ে যায় সে সমৃদ্ধি লাভ করে না। সে তার মত যে নিজেকে ধোঁকা দেয়, এবং এ জীবনের পরে যে আনন্দ ও আরাম তা অবহেলা করে ও ভুলে যায় যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন যারা সিজদা করে।

যে ব্যক্তি তার সিজদায় ভালো করে সে কখনোই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছ থেকে দূরে নয়; আর যে ব্যক্তি অসৌজন্য দেখায় এবং তাঁকে সম্মান করাতে অবহেলা করে যেহেতু তার অন্তর সিজদা অবস্থায় আল্লাহ ছাড়া অন্যকিছুর সাথে যুক্ত তাই সে কখনোই তাঁর নিকটবর্তী হবে না। অতএব সিজদা করো তার সিজদার মত যে নিজেকে মর্যাদাশূন্য দেখে এবং জানে যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে যার উপরে লোকেরা হাঁটা- চলা করে এবং তাকে যে বীর্য থেকে তৈরী করা হয়েছে তা সবার কাছে অপবিত্র এবং তাকে জীবিত সত্তা বানানো হয়েছে যখন তার কোন অস্তিত্ব ছিলো না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সিজদাকে করেছেন ব্যক্তির অন্তরে, গভীরতম সত্তায় ও রুহের ভিতরে তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার ক্ষণ। যে তাঁর নিকটবর্তী হয় সে তিনি ছাড়া আর সবকিছু থেকে দূরে। তুমি কি দেখো না যে সিজদা বাইরের দিকে সম্পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না সব জিনিস থেকে চলে যাওয়া হয় এবং চোখ যা দেখে তার উপর পর্দা পড়ে যায়? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা চান ভেতরের সত্তাও সেরকম হোক। যদি নামাজের ভেতর কারো অন্তর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ছাড়া অন্য কোন কিছুর সাথে যুক্ত থাকে সে সেই জিনিসেরই নিকটবর্তী হয়ে আছে এবং

সে তার নামাজে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যা চান তার বাস্তবতা থেকে বহু দূরে। কারণ তিনি বলেছেনঃ

(مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ)

''আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার বুকের ভেতরে দু'টো অন্তর দেন নি।'' (সূরা আহযাবঃ ৪)

রাসূলুল্লাহ (সা.)- র ভাষায়ঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ ''যখন আমি কোন বান্দাহর অন্তরের উপর তাকাই, আমি জানি সত্যিই আমার জন্য তার আন্তরিক ভালোবাসা ও আনুগত্য আছে কিনা এবং আমার সন্তুষ্টি খোঁজ করে কিনা। এরপর আমি তার দায়িত্ব নেই এবং তাঁর নিকটবর্তী হই। যে তার নামাজে আমাকে ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকে সে তাদের একজন যে নিজেকে নিয়ে মশকরা করে এবং তার নাম ক্ষতিগ্রস্থদের তালিকাতে লেখা হয়।''

তাশাহুদ

তাশাহুদ হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রশংসা। তোমার গভীরতম সত্তায় তাঁর দাস হয়ে যাও তোমার কাজকর্মে তাঁর প্রতি ভীত ও বিনয়ী হয়ে যেহেতু তুমি কথায় ও দাবীতে তাঁর দাস। তোমার জিহবার সত্যবাদীতাকে যুক্ত করো তোমার গভীরতম সত্তার বিশুদ্ধ সত্যবাদিতার সাথে। তিনি তোমাকে দাস হিসাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাকে আদেশ করেছেন তাঁর ইবাদাত করতে তোমার অন্তর, তোমার জিহবা ও তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে। তাঁর প্রতি তোমার দাসত্বকে বাস্তবে অনুভব করো তোমার উপরে তাঁর প্রভুত্বের মাধ্যমে। জেনে রাখো প্রাণীকূলের কপালের চুল তাঁর হাতে। প্রাণীকূল শ্বাসপ্রশ্বাস ও দৃষ্টি ক্ষমতার অধিকারী হয় না তাঁর শক্তি ও ইচ্ছা ছাড়া। তারা তাঁর রাজ্যে সামান্য জিনিসও জন্ম দিতে অক্ষম যদি না তা হয় তাঁর অনুমতি ও ইচ্ছা অনুযায়ী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ)

‘‘তোমার রব সৃষ্টি করেন এবং যাকে তাঁর ইচ্ছা বাছাই করেন; বাছাই করাতে তাদের কোন অধিকার নেই, ত্রুটির উর্ধ্বে আল্লাহ এবং তিনি তারও উপরে যা তারা (তাঁর সাথে) যুক্ত করে।’’ (সূরা কাসাসঃ ৬৮)

অতএব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দাস হও, তাকে স্মরণ করে কথা ও ঘোষণার মাধ্যমে এবং তোমার জিহবার সত্যতাকে সংযুক্ত করো তোমার গভীরতম অন্তরে পবিত্রতার সাথে, কারণ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি এত শক্তিধর ও এত উচ্চ মর্যাদার যে কারো ইচ্ছাশক্তি নেই তাঁর পূর্ববর্তী ইচ্ছা শক্তির মাধ্যম ছাড়া। দাসত্বের অবস্থা পরিপূর্ণ করো তাঁর প্রজ্ঞায় সন্তুষ্ট থেকে এবং ইবাদাতের মাধ্যমে তাঁর আদেশগুলো পালন করার উদ্দেশ্যে।

তিনি তোমাকে আদেশ করেছেন তাঁর হাবীব (ভালোবাসা) মুহাম্মাদের উপরে দরুদ পাঠানোর জন্য, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যেন তাকে ও তার পরিবারের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করেন। অতএব যুক্ত করো তোমার অনুরোধকে মুহাম্মাদের কাছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে তোমার প্রার্থনার সাথে, মুহাম্মাদের প্রতি আনুগত্যকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি আনুগত্যের সাথে এবং তোমার মুহাম্মাদকে দেখার তোমার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে দেখার সাথে। সতর্ক দৃষ্টি রেখো যেন তুমি জ্ঞানের রহমত থেকে বঞ্চিত না হও যা লুকানো আছে তার (মুহাম্মাদ- সাঃ) পবিত্রতার প্রতি সম্মান জানানোর ভেতরে – তা না হলে তার উপরে দরুদ পাঠানোর উপকারিতা লাভের সুযোগ থেকে প্রত্যাখ্যাত হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে আদেশ করেছেন তোমার জন্য ক্ষমা চাইতে এবং তোমার জন্য সুপারিশ করতে যখন তুমি আদেশ ও নিষেধগুলো এবং সুন্নাহ ও যে আদব গুলো (সৌজন্য) আছে যা রাসূলুল্লাহ (সা.)- র মাধ্যমে মানুষের কাছে প্রদর্শিত হয়েছে তা পালন করবে । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে তার মহান মর্যাদা সম্পর্কে তোমার জানা থাকা উচিত।

সালাম

নামাজের শেষে তাসলিম (শান্তির শুভেচ্ছা)- এর অর্থ হচ্ছে নিরাপত্তা, আর তা হলো – যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আদেশ ও তাঁর রাসূলের (সা.) সুন্নাহ পালন করলো তাঁর প্রতি বিনীত হয়ে এবং ভয়ের সাথে সে এ পৃথিবীর দুঃখকষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ করলো এবং আখেরাতের শাস্তি থেকে মুক্ত থাকলো। আল- সালাম (শান্তি) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নামগুলোর একটি, যা তিনি তাঁর সৃষ্টির কাছে আমানত দিয়েছেন যেন তারা তা ব্যবহার করে তাদের আচার ব্যবহারে, আমানত রক্ষায় এবং চুক্তিতে এবং তাদের সাথীদের সমর্থনে ও সমাবেশগুলোতে এবং তাদের সুস্থ সামাজিক সম্পর্কের জন্য।

যদি তুমি সালামকে এর যথাযথ জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাও এবং এর অর্থ পরিপূর্ণ করতে চাও তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে ভয় করো এবং তোমার বিশ্বাস, তোমার অন্তর ও তোমার বুদ্ধিকে সুস্থ করো। এগুলোকে বিদ্রোহের অন্যায় দিয়ে কালিমাযুক্ত করো না। তোমার অভিভাবকরা যেন তোমার কাছ থেকে নিরাপদ থাকে; তাদের প্রতি তোমার দুর্ব্যবহার দিয়ে তাদেরকে দুশ্চিন্তাযুক্ত অথবা বিরক্ত অথবা দূরে সরিয়ে দিও না, তোমার বন্ধুদের সাথেও করো না এবং তোমার শত্রুদের সাথেও করো না। যদি কোন ব্যক্তির নিকটজনরা তার কাছ থেকে নিরাপদ না থাকে তাহলে যারা তার কাছ থেকে সবচেয়ে দূরে তারা সবচেয়ে নিরাপদ। যে ব্যক্তি সালামকে এর যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে না – যখন তা প্রতিষ্ঠা করা উচিত তাহলে তার না আছে শান্তি, না আছে আত্মসমর্পণ। সে তার সালামে মিথ্যাবাদী – যদি সে লোকজনের মাঝে তা ব্যবহার করে শুভেচ্ছা আকারেও।

জেনে রাখো মানুষের অস্তিত্ব বজায় আছে এ পৃথিবীর পরীক্ষা ও দুঃখ কষ্টের মাঝে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে পরীক্ষা করতে পারেন তাঁর রহমত দিয়ে, তার কৃতজ্ঞতাবোধ দেখার জন্য অথবা দুঃখকষ্ট দিয়ে দেখার জন্য যে সে তাঁকে মেনে চলার বিষয়ে দৃঢ়তা ও উঁচু মানসিকতা প্রদর্শন করে কিনা, অথবা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অসম্মানিত হয় কিনা, যদিও তাঁর সন্তুষ্টি ও রহমতে পৌঁছা যায় না তাঁর অনুগ্রহ ছাড়া। তাকে মেনে চলার একমাত্র উপায় হচ্ছে যখন

তিনি সফলতা দান করেনঃ কেউ তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে না তার অনুমতি ও রহমত ছাড়া।

পরিচ্ছেদ- ১২

তওবা

তওবা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার রশি এবং তাঁর বান্দাহদের জন্য মনোযোগের প্রধান মাধ্যম যাদেরকে অবশ্যই অনুতপ্ত থাকতে হবে প্রত্যেক অবস্থায়। বান্দাহদের প্রত্যেক দলেরই রয়েছে এর নিজস্ব ধরনের তওবা।

রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর তওবা হচ্ছে বাইরের বিরক্তি উদ্রেককারী উৎসের কারণে ভেতরের গভীরতম সত্তায় যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয় তার জন্য এবং আউলিয়াদের তওবা আসে তাদের চিন্তার রঙে পরিবর্তন ঘটা থেকে, পরিশুদ্ধদের (আবরার) তওবা নিহিত থাকে তাদেরকে যা সামান্যতম পীড়ন করে তা শান্তভাবে পরিত্যাগ করার ভেতরে, উচ্চস্থানীয়দের তওবা হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ছাড়া অন্য বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে এবং সাধারণ মানুষের তওবা অন্যায় কাজের কারণে। এদের প্রত্যেকেই তাদের তওবার কারণ ও উদ্দেশ্য জানে এবং সে সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু এখানে এসব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে অনেক লম্বা সময় প্রয়োজন হবে।

সাধারণ মানুষের তওবা হলো সে তার অভ্যন্তরীণ সত্তাকে অনুতাপের পানি দিয়ে ধোয় এবং তার ভুল কাজকে সর্বক্ষণ স্বীকার করে। সে যা করেছে তার জন্য দুঃখ করে এবং তার জীবনের যতটুকু বাকী আছে তা নিয়ে ভয় করে। সে তার অন্যায় কাজগুলোকে সামান্য ভাবে না যে, সেক্ষেত্রে তা তাকে অলসতার দিকে নিয়ে যাবে; সে যা হারিয়েছে তার জন্য তার ক্রমাগত কান্না এবং দুঃখ করাটাও একটি ইবাদাত। তার উচিত নিজেকে পৃথিবীর ক্ষুধা থেকে বিরত রাখা এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাহায্য চাওয়া তওবা করার জন্য এবং সে কাজ আবার করা থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য যা সে আগে করেছে। সে নিজেকে অজ্ঞতা ও ইবাদাতের উঠানে প্রশিক্ষণ দেয়। সে বাধ্যতামূলক কাজগুলো যেগুলো সে আগে করে নি তা পূরণ করে এবং সে সাহায্যের জন্য অন্যদের ডাকে সাড়া দেয়। অসৎসঙ্গ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়, রাতে জেগে কাটায়,

দিনের বেলায় পিপাসার্ত থাকে, তার সম্পত্তির উপরে সর্বক্ষণ ভাবে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে সাহায্য চায়, তাঁর কাছে অনুরোধ করে আরাম ও দুঃসময়ে তাকে দৃঢ় রাখার জন্য এবং তার পরীক্ষা ও দুঃখ দুর্দশায় স্থির রাখার জন্য যেন সে তওবাকারীদের মাক্বাম থেকে নীচে পড়ে না যায়। এটি তাকে তার অন্যায় কাজ থেকে পবিত্র করবে, তার জ্ঞান বৃদ্ধি করবে এবং তার মর্যাদা উঁচুতে উঠানো হবে। যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ)

''আর আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে জেনে নিবেন যারা সত্যবাদী এবং অবশ্যই জেনে নিবেন মিথ্যাবাদীদের।'' (সূরা আনকাবুতঃ ৩)

নিজেকে গুটিয়ে নেয়া (উযলাহ)

যে ব্যক্তি পৃথিবী থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে দুর্গের ভেতর নেন এবং নিরাপত্তা দেন তার অভিভাবকত্বের (বেলায়েতের) মাধ্যমে। যে ব্যক্তি নিজেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর কাছে গুটিয়ে নিয়েছে তার কীইনা আনন্দ, এটি করার জন্য তাকে অবশ্যই পার্থক্য করতে হবে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে, দারিদ্র্যকে ভালোবাসতে হবে, দুঃখ কষ্ট এবং বিরত থাকাকে বেছে নিতে হবে এবং নিজেকে গুটিয়ে নেয়ার প্রত্যেকটি সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। তাকে অবশ্যই তার প্রত্যেকটি কাজের ফলাফল নিয়ে ভাবতে হবে, ইবাদাত করবে যত বেশী সম্ভব, অহংকার পরিত্যাগ করবে এবং সর্বক্ষণ যিকর- এ নিয়োজিত থাকবে উদাসীনতা ছাড়া – যা হলো শয়তানের শিকারের ভূমি এবং প্রত্যেক দুর্দশার শুরু, আর এসব কিছুর কারণ অস্পষ্ট। তার উচিত তার বাড়ি থেকে সব কিছু বিদায় করে দেয়া যার শীঘ্রই কোন প্রয়োজন নেই। ঈসা (আ.) বলেছেনঃ ''তোমার জিহবাকে পাহারা দাও যেন তোমার অন্তরে উন্নয়ন ঘটাতে পারো এবং তোমার বাসস্থানকে তোমার জন্য যথেষ্ট বানাও। লোক দেখানো এবং অতিরিক্ত রিযক থাকা থেকে সাবধান থাকো। তোমার রবের সামনে নম্র হও এবং তোমার ভুলের জন্য কাঁদো। লোকজন থেকে পালাও যেভাবে তুমি পালাও সিংহ ও বিষাক্ত সাপ থেকে। সেগুলো ছিলো ঔষধ এবং এখন সেগুলো রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে সাক্ষাত করো যেখানে তুমি চাও। রাবি ইবনে কুসাইম বলেছিলোঃ ''যদি তুমি আজ এমন কোন স্থানে যেতে পারো যেখানে তুমি কাউকে চেনো না এবং যেখানে তোমাকে কেউ চেনে না তাহলে তাই করো।'' নিজেকে গুটিয়ে নিলে তা আনে অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের জন্য নিরাপত্তা, একটি মুক্ত অন্তর, সুস্থ রিযক, শয়তানের অস্ত্রগুলোর ধ্বংস, প্রত্যেক খারাপকে এড়িয়ে চলা এবং অন্তরের জন্য বিশ্রাম। কোন নবী নেই এবং কোন নবীর ওয়াসী নেই যে তার জীবনে একবার নিজেকে গুটিয়ে নেয় নি, হয় তার শুরুতে অথবা তার শেষে।

নিরব থাকা

নিরবতা তাদের চিহ্ন যারা সেসব বাস্তবতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে যা ইতোমধ্যেই এসেছে এবং যার বিষয়ে কলম ইতোমধ্যেই লিখেছে। এটি হচ্ছে এ পৃথিবী ও আখেরাতের সব বিশ্রামের চাবি : এটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টি আনে, আমলের হিসাবকে সহজ করে এবং এটি ভুলত্রুটি থেকে একটি নিরাপত্তা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এটিকে পর্দা বানিয়েছেন মূর্খদের জন্য এবং অলংকার বানিয়েছেন জ্ঞানীদের জন্য।

নিরবতার মাধ্যমে কামনা- বাসনাকে একপাশে সরিয়ে রাখা যায় এবং এর সাথে আসে আত্ম-শৃঙ্খলা, ইবাদাতের মিষ্টতা, হৃদয়ের কাঠিন্য দূরীভূত হওয়া, বিরত থাকা, ধার্মিকতা এবং জ্ঞান ভান্ডার। অতএব তোমার জিহবাকে তালা মারো সে কথার উপরে যা অত্যন্ত জরুরী নয়, বিশেষ করে যখন তুমি দেখো তুমি কারো সাথে কথা বলবে এমন কোন যোগ্য লোক দেখছো না; তখন ছাড়া যখন তুমি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে কথা বলছো।

রাবি ইবনে কুসাইম একটি মোটা কাগজ তার সামনে রাখতো যার উপরে সে লিখে রাখতো সে দিনের বেলায় কী বলেছে। রাতে সে নিজে নিজের হিসাব নিতো তার বেঁচে থাকাকালেই। দেখতো সে কী বলেছে নিজের পক্ষে এবং নিজের বিপক্ষে। এরপর সে বলতোঃ ‘‘হায়, যারা নিরব তারা রক্ষা পেয়েছে।’’

রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর একজন সাহাবী তার মুখের ভেতরে নুড়িপাথর ভরে রাখতো। যখন সে কিছু বলতে চাইতো তখন যদি সে জানতো তা আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি, আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পথে এবং আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য, তখন সে তার মুখের ভেতর থেকে তা বের করতো। সাহাবীদের অনেকেই এমনভাবে শ্বাস প্রশ্বাস নিতেন যেন মনে হতো কোন ডুবন্ত মানুষের শ্বাস- প্রশ্বাস এবং কথা বলতেন অসুস্থ মানুষের মত।

মানুষের ধ্বংস নিহিত আছে তার কথা- বার্তা ও নিরবতার মাঝে

সৌভাগ্য তাদের যাদেরকে কথাবার্তায় কী সঠিক ও কী ভুল এ সম্পর্কে এবং নিরবতার বিজ্ঞান ও এর সুবিধাগুলো সম্পর্কে জ্ঞান দেয়া হয়েছে। কারণ এটি রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর গুণাবলীর একটি এবং নির্বাচিত ব্যক্তিদের বিশেষ চিহ্ন। যে কথার মূল্য বোঝে সে নিরবতার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। যদি ব্যক্তিকে নিরবতার সুক্ষ্ম বিষয়গুলো দেখানো হয় এবং এর মূল্যবান ভান্ডার তার কাছে গচ্ছিত রাখা হয় তখন তার কথা ও নিরবতা উভয়ই ইবাদাত। এ ইবাদাতের রহস্য শুধু তিনিই জানেন যিনি সবার বাদশাহ, সর্ববাধ্যকারী আল্লাহ।

বুদ্ধি ও কামনা- বাসনা

বুদ্ধিমান মানুষ যা সত্য তার কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং তার বক্তব্য হয় ন্যায়পরায়ণ; যা মিথ্যা তা থেকে সে কুঁকড়ে সরে যায় এবং তার কথায় এর বিরোধিতা করে। সে এ পৃথিবীকে পিছনে ঠেলে দেয় কিন্তু তার বিশ্বাসকে ত্যাগ করে না।

বুদ্ধিমান মানুষের প্রমাণ দু'টো জিনিসে নিহিত : সত্য কথা এবং সঠিক কাজ। বুদ্ধিমান মানুষ এমন কিছু বলে না যা বুদ্ধি প্রত্যাখ্যান করে, না সে নিজেকে সন্দেহে পড়তে দেয়, না সে পরিত্যাগ করে তাদের সাহায্য যারা পরীক্ষিত। তার কাজকর্মে জ্ঞান পথ দেখায়; যে পথে সে চলে সেখানে ইরফান (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) তার নিশ্চয়তা এবং সহনশীলতা তার সার্বক্ষণিক সাথী। কামনা- বাসনা বুদ্ধির শত্রু, সত্যের প্রতিপক্ষ এবং মিথ্যার সাথী। কামনা- বাসনার শক্তি আসে দুনিয়ার ক্ষুধা থেকে এবং এর প্রাথমিক প্রকাশ হচ্ছে হারাম কাজ করা, দায়িত্বে অবহেলা করা, সুন্নাহকে হালকা করে দেখা এবং আনন্দ ফুর্তিতে মগ্ন হওয়া।

পরিচ্ছেদ- ১৩

ঈর্ষা

একজন ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি আগে নিজেরই ক্ষতি করে যার প্রতি সে ঈর্ষাপরায়ণ তাকে ক্ষতি করার আগে, ঠিক যেমনটি ঘটেছিলো ইবলিসের বেলায়। তার ঈর্ষার কারণে সে অভিশাপকে নিজের উপরে বয়ে এনেছিলো, অথচ আদমের জন্য সে এনেছিলো নির্বাচন, হেদায়েত, প্রকৃত চুক্তির স্তরে আরোহণ এবং বাছাই হওয়া। অতএব তোমার প্রতি ঈর্ষা করা হোক ঈর্ষাকাতর হওয়ার চাইতে, কারণ ঈর্ষাপরায়ণের শাস্তি সবসময় যাকে ঈর্ষা করা হয় তার চেয়ে বেশী; এভাবেই রিযক(জীবনোপকরণ) নির্ধারন করা হয়।

লোভ

বলা হয়েছে যে কাব আল আহবারকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো বিশ্বাসের মধ্যে সবচেয়ে সুস্থ জিনিস এবং সবচেয়ে কলুষিত কী? সে উত্তর দিয়েছিলোঃ সবচেয়ে সুস্থ জিনিস হলো সতর্কতা এবং সবচেয়ে কলুষিত হলো লোভ।

সম্পদের লোভ হচ্ছে শয়তানের মদ, যা সে নিজ হাতে তুলে দেয় তার পছন্দনীয়দের জন্য। যে এতে মাতাল হয় সে আল্লাহর শাস্তির ব্যাথ্যতেই শুধু ভদ্র হয় - যে তাকে এ পানীয় দিয়েছিলো তার নিকটে অবস্থান করে। বিশ্বাসের বদলে মানুষের এ পৃথিবী পছন্দ করা ছাড়া যদি লোভের জন্য আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে শাস্তির আর কোন কারণ না থাকতো, তাহলেও তা মারাত্মক শাস্তির কারণ হতো। আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ)

‘‘তারা হলো যারা সঠিক পথের বিনিময়ে ভুল কিনে—।’’ (সূরা বাকারাঃ ১৬)

বিশ্বাসীদের আমীর বলেছেনঃ ''তুমি যার প্রতি ইচ্ছা উদার হও এতে তুমি হয়ে যাবে তার রাজপুত্র। যার কাছ থেকে ইচ্ছা সাহায্য প্রার্থনা করো এতে তুমি তার সমান হয়ে যাবে। তুমি যার প্রয়োজনে থাকো তার হাতে তুমি বন্দী''। যে লোভী তার কাছ থেকে বিশ্বাস কেড়ে নেয়া হয় সে তা টেরও পায় না। কারণ বিশ্বাস বান্দাহকে সৃষ্টিগতভাবে লোভী হতে বাধা দেয়। তিনি আরও বলেছেনঃ ''হে আমার বন্ধু, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভান্ডার সম্মানের পদক দিয়ে পূর্ণ এবং যে ভালো আচরণ করে তাকে পুরস্কৃত করতে তিনি অবহেলা করেন না।''

মানুষের যা আছে তা কলংকিত হয় ত্রুটি দিয়ে। বিশ্বাস তাকে উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহর উপর আস্থা রাখতে, মধ্যপন্থায়, কামনা- বাসনা পরিত্যাগ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আনুগত্যকে আঁকড়ে থাকতে এবং জনগণের বিষয়ে নিরাশ হতে। যদি সে তা করে তাহলে তার বিশ্বাসের কাছেই আছে এবং সঠিক পথ অবলম্বন করেছে। যদি সে তা না করে তাহলে বিশ্বাস তাকে ছেড়ে যায় এবং তাকে তার খারাপ প্রকৃতির কাছে ফেলে যায়।

কলুষতা

বাইরের সত্তায় কলুষতা আসে ভেতরের কলুষতা থেকে। যদি তুমি তোমার গভীরতম সত্তাকে ঠিক কর তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তোমার বাইরের সত্তাকে ঠিক করে দিবেন; যদি তুমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে ভেতরে ভয় কর তাহলে তিনি জনগণের সামনে তোমার চাদর ছিঁড়বেন না। কিন্তু যে ভিতরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে বাইরে প্রকাশ করে দেবেন।

সবচেয়ে বেশী কলুষতার জন্ম হয় দীর্ঘ আশা, লোভ এবং গর্ব থেকে যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে ক্বারুনের ঘটনা বলেছেনঃ

(وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)

‘‘পৃথিবীতে ফাসাদ (কলুষতা) সৃষ্টির সুযোগ খুঁজো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসাদ (কলুষতা) সৃষ্টিকারীদের ভালোবাসেন না’’ (সূরা কাসাসঃ ৭৭)

অন্য জায়গায় তিনি বলেছেনঃ

(تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)

‘‘আখেরাতের বাসস্থান, আমরা তা তাদেরকেই শুধু দেই যাদের ইচ্ছা নেই এ পৃথিবীতে গর্ব করার এবং ফাসাদ (কলুষতা সৃষ্টি) করার এবং সমাপ্তি ভালো তাদের যারা মুত্তাক্বী (সতর্কতা অবলম্বনকারী)।’’ (সূরা কাসাসঃ ৮৩)

এ ত্রুটিগুলো আসে তা থেকে যা ক্বারুন করতো ও বিশ্বাস করতো। কলুষতার মূল নিহিত আছে এ পৃথিবীর ভালোবাসায়, এর সম্পদ জমা করায়, নিজের নফসকে অনুসরণ করায়, এর ক্ষুধাকে বৃদ্ধি করায়, প্রশংসা পছন্দ করায়, শয়তানের সাথে একমত হওয়ায় এবং তার পদাঙ্ক অনুসরণ করায়; এ সবগুলো দোষ যুক্ত হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি কোন মনোযোগ না দেয়া পছন্দ করায় এবং তাঁর দানসমূহ ভুলে যাওয়ার সাথে।

অতএব, তোমার উচিত মানুষজনের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া, এ পৃথিবীকে প্রত্যাখ্যান করা, তোমার বিশ্রামের মাঝে বাধা দেয়া, তোমার সাধারণ স্বভাবগুলোর সাথে সম্পর্ক ছেদ করা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে সর্বক্ষণ স্মরণ করার মাধ্যমে দুনিয়ার ক্ষুধাগুলোর উৎসকে গোড়া থেকে কেটে ফেলা এবং তাঁর আনুগত্যকে আঁকড়ে থাকা এবং লোকজনের, ও তোমার কোন সাথীর অতিরিক্ত নির্ভরতা এবং তোমার পরিবার ও আত্মীয়দের শত্রুতা সহ্য করা। যদি তুমি তা কর তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দয়ার দরজা তোমার জন্য খোলা হবে, যেহেতু তোমার প্রতি তাঁর আছে ভালো মনোভাব, ক্ষমা এবং রহমত। এতে তুমি কথা অগ্রাহ্যকারীদের দল পরিত্যাগ করবে এবং শয়তানের হাতে বন্দী থাকা তোমার অন্তরকে মুক্ত করবে। তুমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দরজায় উপস্থিত হবে তাদের সাথে যারা তাঁর কাছে আসে এবং তুমি এমন এক পথে ভ্রমণ করবে যার উপরে তুমি আশা করতে পারো পরম মর্যাদাবান, পরম সম্মানিত, পরম উদার ও পরম করুণাময়ের কাছে আসার জন্য অনুমতি।

সুস্থতা

যেখানেই তুমি থাকো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে সুস্থতা চাও প্রত্যেক অবস্থায়, তোমার বিশ্বাসের জন্য, তোমার অন্তরের জন্য এবং তোমার সর্বশেষ পরিণতির জন্য। যে তা চায় সে সবসময় তা পায় না।

তাহলে কীভাবে কিছু লোক পারে নিজেদেরকে দুঃখ কষ্টের মুখোমুখি করতে, সুস্থতার উল্টো পথে চলতে এবং এর নীতিগুলোর বিরোধিতা করতে- নিরাপত্তাকে ধ্বংস ও ধ্বংসকে নিরাপত্তা ভেবে?

প্রত্যেক যুগেই সুস্থতাকে মানুষের কাছ থেকে তুলে নেয়া হয়েছে, বিশেষ করে এই যুগে, তবুও তা আবার খুঁজে পাওয়া যাবে অন্য মানুষের অপছন্দ এবং এমনকি আঘাত সহ্য করার মাধ্যমে, দুর্যোগের মুখে ধৈর্য্য ধরার মাধ্যমে, মৃত্যুকে হালকা ভাবে নিয়ে, যা কিছু ঘৃণ্য তা থেকে পালিয়ে গিয়ে এবং সামান্য বস্তুগত সম্পদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমে। যদি তুমি সেরকম না হও

তাহলে তোমাকে অবশ্যই নিজেকে গুটিয়ে নিতে হবে। যদি তুমি তা না করতে পারো তাহলে নিরব থাকো, যদিও নিরবতা নিজেকে গুটিয়ে নেয়ার মত নয়। যদি তুমি নিরব না হতে পারো তাহলে তা বলো যা তোমাকে সাহায্য করবে এবং তোমার ক্ষতি করবে না। কিন্তু তা নিরবতার মত নয়, যদি তুমি তা করার জন্য কোন উপায় না দেখ তাহলে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াও, নিজের নফসকে নিয়ে যাও আগে যাও নি এমন এলাকায়, বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য, বিনীত অন্তর ও দৃঢ় দেহ নিয়ে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا)

‘‘নিশ্চয়ই যারা নিজেদের উপর যুলুমকারী, তাদের প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতারা বলেঃ ‘তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?’ তারা বলেঃ ‘আমরা (আমাদের) দেশে দূর্বল ছিলাম’ তারা বলবেঃ ‘আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলো না যে তোমরা সেখানে হিযরত করতে পারতে.... ?’’ (সূরা নিসাঃ ৯৭)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সৎকর্মশীল বান্দাহদের সে চরিত্র গ্রহণ কর।

অস্পষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে সংগ্রাম করো না, এবং পরস্পরবিরোধী বিষয় নিয়েও সন্তুষ্ট থেকো না। যদি কেউ তোমাকে বলে, ‘আমি’, বলো ‘তুমি’। কোন বিষয়ে জ্ঞানের দাবী করো না, যদি সে বিষয়ে তুমি বিশেষজ্ঞও হও। তোমার গোপন বিষয় শুধু তার কাছেই উম্মুক্ত করো যে তোমার চেয়ে বিশ্বাসে উন্নত। এভাবে তুমি সম্মান পাবে। যদি তুমি এটি কর তাহলে তুমি সুস্থতা পাবে এবং তুমি থাকবে মহান আল্লাহর সাথে অন্য কিছুর সাথে সংযুক্ত না থেকে।

পরিচ্ছেদ- ১৪

ইবাদাত

ইবাদাতের রীতিনীতি ও বাধ্যতামূলক বিষয়গুলো পালনে অধ্যাবসায়ী হও কারণ সেগুলো হচ্ছে উৎস : যে সেগুলো অর্জন করে এবং তা সঠিকভাবে পালন করে সে সবকিছুই পেলো। সবচেয়ে ভালো ইবাদাত হচ্ছে যা নিরাপত্তার কাছাকাছি আসে। এটি সবচেয়ে ক্ষতিমুক্ত এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তা যত ছোটই হোক। যদি তুমি তোমার বাধ্যতামূলক ও অতিরিক্ত (নফল) নামায পড়ে থাকো তাহলে তুমি সত্যিকার ইবাদাতকারী।

বাদশাহর গালিচায় পা রাখার বিষয়ে সাবধান থাকো যদি না তুমি তা কর নিজেকে মর্যাদাশূন্য মনে করে, প্রয়োজন স্বীকার করে, ভয় করে এবং সম্মান দেখিয়ে। তোমার নড়াচড়াকে লোক দেখানো মুক্ত করো এবং তোমার গোপনকে কাঠিন্য মুক্ত করো।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ''যে ব্যক্তি নামায পড়ছে সে তার রবের সাথে কথা বিনিময় করছে।'' তাই লজ্জিত থাকো তাঁর সামনে যিনি তোমার গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন, যিনি তোমার কথাবার্তা শুনছেন এবং তোমার বিবেক যা লুকায় তাও জানেন। সেখানেই উপস্থিত থাকো যেখানে তিনি তোমাকে তা করতে দেখবেন যা তিনি চান তুমি কর এবং দেখবেন তা সম্পাদন করতে যা করার জন্য তিনি তোমাকে ডেকেছেন। যারা আমাদের আগে চলে গেছেন তারা নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছিলেন একটি বাধ্যতামূলক নামায শেষ করার মুহূর্ত থেকে আরেকটি শুরু করার মুহূর্ত পর্যন্ত যেন তারা দু'টো নামাযই সম্পাদন করতে পারেন আন্তরিকভাবে ও সঠিকভাবে। মনে হচ্ছে আমাদের সময়ে বাধ্যতামূলক ইবাদাত ছেড়ে দেয়া একটি নৈতিকগুণে পরিণত হয়েছে যা হলো একটি দেহ থাকার মত যার কোন আত্মা নেই।

আলী (আ.) ইবনে আল হোসেইন (আ.) বলেছেনঃ ''আমি আশ্চর্য হই ঐ ব্যক্তিকে নিয়ে যে অতিরিক্ত কিছু চায় অথচ বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পরিত্যাগ করে; সে তা শুধু এজন্য করে যে তার

এ বিষয়ে যথাযথ স্বীকৃতি নেই এবং এর প্রতি তার সম্মানের অভাব রয়েছে। মানুষকে তাঁর আদেশ মানতে প্রস্তুত করাতে এবং তাদের জন্য তা নির্বাচনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ইচ্ছাকে সে দেখতে পায় না।

গভীর ভাবনা

এ পৃথিবীর যা অতীত হয়ে গেছে তার উপর গভীরভাবে ভাবো । এর কোন অংশ কি কারো জন্য রয়ে গেছে? কেউ কি রয়ে গেছে, হোক উচ্চ সম্মানিত অথবা মর্যাদাশূন্য, ধনী অথবা দরিদ্র, বন্ধু অথবা শত্রু? একইভাবে এখানে এখনও যা ঘটে নি তার সাথে ঘনিষ্ট মিল রয়েছে যা ইতোমধ্যেই অতীত হয়েছে। পানির সাথে পানির যে মিল আছে তার চেয়ে বেশী। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ''মৃত্যু সতর্ককারী হিসাবে যথেষ্ট, বুদ্ধি পথ প্রদর্শক হিসাবে যথেষ্ট; তাক্বওয়া (সতর্কতা অবলম্বন) জীবনোপকরণ হিসাবে যথেষ্ট; ইবাদাত পেশা হিসাবে যথেষ্ট; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ঘনিষ্ট বন্ধু হিসাবে যথেষ্ট; কোরআন সত্য-মিথ্যা স্পষ্ট করার জন্য যথেষ্ট।'' এবং অন্য জায়গায় বলেছেনঃ ''এ পৃথিবীর যা বাকী আছে তা হলো দুঃখ দুর্দশা ও পরীক্ষা। যদি কোন ব্যক্তি রক্ষা পায় তাহলে তা ঘটে শুধু আন্তরিকভাবে আশ্রয় চাওয়ার মাধ্যমে।'' নূহ (আ.) বলেছিলেনঃ ''আমি পৃথিবীকে পেয়েছি একটি বাড়ির মত যার দু'টো দরজা আছে। আমি এর একটি দিয়ে প্রবেশ করেছি এবং অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছি''।

এরকমই হচ্ছে তার অবস্থা যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা রক্ষা করেছেন। তাহলে তার অবস্থা কী যে এ পৃথিবীতে আরাম বোধ করে, এর উপরে নির্ভর করে, একে চাষ করার মাধ্যমে তার জীবনকে নষ্ট করে এবং যে পৃথিবীর চাহিদায় পূর্ণ?

গভীর ভাবনা ভালো কাজগুলোর আয়না এবং খারাপ কাজগুলোর কাফফারা। এটি অন্তরের আলো এবং অন্যদেরকে স্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্চয়তা দেয় এবং আখেরাতের বাসস্থান লাভের জন্য উত্তম। এটি মানুষকে তার কাজকর্মের ফলাফলকে আগে ভাগেই দেখতে সাহায্য করে এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ইবাদাত অতুলনীয় হয়ে দাঁড়ায় যখন এ গুণটি সাথে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

''এক ঘন্টার জন্য গভীর ভাবনা এক বছরের ইবাদাতের চেয়ে উত্তম।''

গভীর ভাবনার মাক্বাম শুধু তারাই লাভ করে যাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বেছে নিয়েছেন ইরফানি নূর (মারেফাত) এবং তাওহীদের জন্য

বিশ্রাম

বিশ্বাসী শুধু তখনই সত্যিকার বিশ্রাম অর্জন করে যখন সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার মোলাক্বাত লাভ করে। যদিও বিশ্রাম এ চারটি জিনিসের মাধ্যমে লাভ করা যেতে পারে – 'নিরবতা' – যার মাধ্যমে তুমি বুঝতে পারো তোমার অন্তরের অবস্থা এবং তোমার সৃষ্টিকর্তার সাথে তোমার সত্তার সম্পর্ক সম্পর্কে; নিজেকে গুটিয়ে নেয়া – যার মাধ্যমে তুমি যুগের খারাপ বিষয়গুলো থেকে রক্ষা পাবে প্রকাশ্যে ও সত্তার ভেতরে; 'ক্ষুধা' – যা দেহের মাংসের ক্ষুধা ও লোভকে হত্যা করে এবং 'রাত্রিজাগরণ' – যা তোমার অন্তরকে আলোকিত করে, তোমার প্রকৃতিকে পবিত্র করে এবং তোমার আত্মাকে পরিষ্কার করে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ''যদি কোন ব্যক্তি ভোর বেলায় নিজের অন্তরকে পায় প্রশান্ত, শরীরকে সুস্থ্য এবং সেদিনের জন্য খাবার, তা যেন এমন যে সারা পৃথিবী তার জন্য পছন্দ করা হয়েছে।'' ওয়াহাব ইবনে মুনাবিবহ উপরের এবং নীচের কথাগুলো উদ্ধৃত করেছেন রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে- যিনি বলেছেনঃ ''হে সন্তুষ্টি – সম্মান ও ধন সম্পদ তোমার কাছেই পাওয়া যায়। যে জিতে সে তোমার মাধ্যমেই জিতে।''

আবু আল- দারদা বলেছেনঃ ''যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন তা আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে না, এমনও যদি হয় তা বাতাসের পাখার উপর আছে এবং আবু যার বলেছেনঃ ''যে ব্যক্তি তার রবকে বিশ্বাস করে না তার গোপন বিষয় সবসময় প্রকাশ হয়ে যায়, যদি তা শক্ত পাথরের ভেতরেও বন্দী থাকে।'' কেউ এর চেয়ে বেশী ক্ষতিতে নেই, এর চেয়ে জঘন্য এবং এর চেয়ে নীচে নেই সে ব্যক্তির চাইতে যে বিশ্বাস করে না যে তার রব তার জন্য নিশ্চয়তা দিয়েছেন এবং তাকে তিনি সৃষ্টি করার আগেই তার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ দান করেছেন । এর পরেও এই ব্যক্তি নির্ভর করে তার শক্তি, ব্যবস্থাপনা, প্রচেষ্টা এবং সংগ্রামের

উপর এবং তার রবের দেয়া সীমানা অতিক্রম করে পথ ও উপায় খোঁজ করতে গিয়ে যার কোন প্রয়োজন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার জন্য রাখেন নি।

পরিচ্ছেদ- ১৫

সম্পদের লোভ

সম্পদের লোভে কোন কিছু চেয়ো না; কারণ তুমি যদি তা উপেক্ষাও কর তা তোমার কাছে আসবেই, যদি তা তোমার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। তখন তুমি তোমার অন্তরে আল্লাহর সাথে আরাম পাবে এবং তা ত্যাগ করার জন্য পাবে প্রশংসা; কিন্তু তোমাকে অভিযুক্ত করা হবে তা খোঁজায় তাড়াহুড়া করার জন্য এবং তাঁর উপর আস্থা না রাখার জন্য এবং আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না থাকার জন্য। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এ পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন একটি ছায়ার মত; যখন তুমি এর পেছনে ছোট, তা তোমাকে ক্লান্ত করে ফেলে এবং একে তুমি কখনোই ধরতে পারো না। যদি তুমি একে ছেড়ে দাও তা তোমার পিছনে লেগে থাকবে সর্বক্ষণ এবং তোমাকে ক্লান্ত হওয়ার জন্য কোন কারণ দেবে না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ''সম্পদ- লোভী ব্যক্তি বঞ্চিত; সে বঞ্চিত থাকা সত্ত্বেও যেখানেই সে থাকুক সে অভিযুক্ত । কারণ সে বঞ্চিত ছাড়া আর কী হবে যখন সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার চুক্তি থেকে পালায় এবং তাঁর কথার বিরোধিতা করেঃ

(اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ)

''আল্লাহ্, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এরপর তোমাদের জীবনোপকরণ দিয়েছেন। এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দেন এরপর তোমাদেরকে জীবিত করেন।'' (সূরা রূমঃ ৪০)

সম্পদ- লোভী ব্যক্তি সাতটি কঠিন সমস্যাপূর্ণ খারাপের মাঝে থাকেঃ চিন্তা – যা তার দেহের ক্ষতি করে কিন্তু কোন সাহায্য করে না; দুঃশ্চিন্তা- যার কোন শেষ নেই; মানসিক ক্লান্তি – যা থেকে সে বিশ্রাম পাবে শুধু মৃত্যুতে, যদিও সে বিশ্রামের সময়ই সবচেয়ে বেশী মানসিক ক্লান্তিতে থাকে; ভয় – যা সে ভয় করে তাকে তার মধ্যেই ফেলে; দুঃখ- যা তার ভরণপোষণে তার কোন লাভ না এনে সমস্যার সৃষ্টি করে; হিসাব নিকাশ – যা তাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া

তায়ালার শাস্তি থেকে রক্ষা করবে না যদি না তিনি তাকে ক্ষমা করেন এবং শাস্তি – যা থেকে কোন পলায়ন অথবা রক্ষা নেই।

যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি আস্থা রাখে সে সকাল ও সন্ধ্যা তাঁর দেয়া নিরাপত্তা ও সুস্থতার ভেতর কাটায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার যা প্রয়োজন তা তার জন্য দ্রুত এগিয়ে দিয়েছেন এবং তার জন্য প্রস্তুত করেছেন বিভিন্ন জিনিস যা শুধু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা জানেন।

সম্পদের লোভ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ক্রোধ থেকে প্রবাহিত হয়। যখন বান্দাহ ইয়াক্বীনবিহীন নয় তখন সে সম্পদ লোভী নয়। ইয়াক্বীন হলো ইসলামের যমীন এবং ঈমানের আকাশ।

সত্যমিথ্যার স্পষ্ট প্রকাশ -

আরেফদের ঘনিষ্ট কথোপকথন- এ রয়েছে তিনটি মূল : ভয়, আশা ও প্রেম। ভয় হচ্ছে জ্ঞানের শাখা, আশা হচ্ছে ইয়াক্বীনের শাখা এবং প্রেম হচ্ছে মারেফাতের শাখা। ভয়ের প্রমাণ হচ্ছে পলায়ন, আশার প্রমাণ হচ্ছে সন্ধান এবং প্রেমের প্রমাণ হচ্ছে অন্য সবার উপরে মাহবুবকে (যাকে ভালোবাসা হয়) স্থান দেয়া।

যখন জ্ঞানের সত্যায়ন হয় সত্যবাদিতায় তখন সে ভয় পায়। যখন ভয় হয় সত্যিকার – সে পালায়। যখন সে পালায় – সে রক্ষা পায়। যখন সে অন্তরে ইয়াক্বীনের নূর দেখতে পায় সে উপচে পড়া নেয়ামত দেখতে পায়। যখন উপচেপড়া নেয়ামতের দৃশ্য দৃঢ় হয় তখন আশা আছে। যখন সে আশার ভেতরে বিশ্বাসের মিষ্টতা অনুভব করে – সে সন্ধান করে। যখন সে সন্ধানে সাফল্য লাভ করে সে তা পায়। যখন মারেফাতের নূর তার অন্তরে প্রকাশিত হয় – তখন প্রেমের মৃদু- বাতাস নড়ে উঠে, সে মাহবুবের ছায়ায় আশ্রয় নেয় এবং মাহবুবকে সবার উপরে স্থান দেয়, তাঁর আদেশগুলো মেনে চলে এবং তাঁর নিষেধগুলো এড়িয়ে চলে এবং সবকিছুর উপরে সেগুলোকে স্থান দেয়। যখন সে নিবিড় সান্নিধ্যের জন্য অধ্যাবসায় চালায় তাঁর আদেশ মেনে ও নিষেধ এড়িয়ে চলার মাধ্যমে তখন সে নিবিড় মিলন ও নৈকট্যের আত্মায় পৌঁছে গেছে।

এ তিনটি মূল হচ্ছে আশ্রয়কেন্দ্র, মসজিদ ও কাবাঘরের মত : যে এ পবিত্র অঙ্গনে প্রবেশ করলো সে অন্য লোকদের কাছ থেকে নিরাপদ হয়ে গেলো। যদি কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে তাহলে তার ইন্দ্রিয়গুলো অবাধ্যতায় ব্যবহার হওয়া থেকে নিরাপদ হয়ে গেলো এবং যে ব্যক্তি কাবা ঘরে প্রবেশ করলো তার অন্তর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা স্মরণ ছাড়া অন্য যে কোন বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকা থেকে নিরাপদ হয়ে গেলো।

হে বিশ্বাসী, মনোযোগ দাও, যদি তুমি এমন অবস্থায় থাকো যে তুমি মৃত্যুর সাথে সাক্ষাতের বিষয়ে সন্তুষ্ট আছো তাহলে আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাও তার অনুগ্রহ ও নিরাপত্তা দানের জন্য।

যদি তা এছাড়া অন্য কিছু হয় তাহলে দৃঢ় সিদ্ধান্তের সাথে এ থেকে সরে যাও এবং তোমার জীবনের সে অংশের জন্য দুঃখ করো যা উদাসীনতায় কেটেছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাহায্য চাও তোমার বাইরের প্রকৃতিকে অন্যায় কর্মকান্ড থেকে পবিত্র করার জন্য এবং তোমার ভেতরের সত্তার ত্রুটিগুলোকে সাফ করো। কথা গ্রাহ্য না করার শেকলগুলোকে তোমার অন্তর থেকে কেটে ফেলো এবং তোমার নফসের কামনা- বাসনার আগুনকে নিভিয়ে ফেল।

বিচারবোধ

অন্তর চার প্রকারের হতে পারে : উচুঁতে উঠানো, খোলা, নীচু এবং থেমে থাকা। অন্তর উঁচুতে উঠা (রাফ) নিহিত রয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার স্মরণের মাঝে, অন্তর খোলা (ফাতহ) নিহিত রয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টিতে, অন্তরের নীচু (খাফদ) হয়ে থাকা নিহিত রয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে মগ্ন থাকার ভেতরে এবং অন্তরের থেমে থাকা (ওয়াক্ফ) নিহিত রয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ছাড়া সবকিছুতে সাড়া দেয়াতে।

তুমি কি দেখো না যে যখন কোন বান্দাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে আন্তরিক শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ও তার মাঝে প্রত্যেক পর্দা সরিয়ে দেয়া হয়? যদি অন্তর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সিদ্ধান্তের উৎস মেনে নেয় এবং তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে তাহলে কীভাবে সুখ, আনন্দ ও পৃথিবীর আরাম নিজেদেরকে তার কাছে মেলে ধরবে? যখন অন্তর পৃথিবীর কিছু বিষয় ও উপায় নিয়ে ভাবনায় ব্যস্ত থাকে তখন কীভাবে তা খুঁজে পাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কী বলেছেন? তখন অন্তর সংকীর্ণ ও অন্ধকার হয়ে যায় একটি জনমানবহীন ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির মত, যার না আছে কোন সমৃদ্ধি আর না আছে কোন বাসিন্দা। যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার স্মরণ থেকে অমনোযোগী হয়ে পড়ে তখন তুমি তাকে দেখবে তার অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দেয়া হয়েছে এবং পর্দার নীচে পড়ে গেছে। সে হয়ে গেছে

অনড় ও অন্ধকার, সেই আলো পরিত্যাগ করার কারণে যা রব- এর প্রতি বান্দাহর শ্রদ্ধা প্রদর্শন থেকে উৎসারিত হয়। উচুঁতে উঠার (রাফ) চিহ্ন নিহিত আছে প্রত্যেক বিষয়ে একমত থাকায়, বিরোধিতার অনুপস্থিতিতে এবং সার্বক্ষণিক আকাঙ্ক্ষায়। ফাতহ (খোলা) নিহিত রয়েছে আল্লাহর উপরে আস্থাপূর্ণ নির্ভরতায়, সত্যবাদিতা ও ইয়াক্বীনের মাঝে। খাফদ (নীচু হয়ে থাকা)- এর চিহ্ন নিহিত আছে গর্ব, লোক দেখানো এবং লোভের মাঝে; এবং ওয়াক্বফ (থেমে থাকা)- এর চিহ্ন নিহিত আছে আনুগত্যের মিষ্টতার প্রস্থানে, বিদ্রোহের তিক্ততায় এবং কী হারাম ও কী হালাল, সেই জ্ঞানে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়াতে।

মিসওয়াক (দাঁত মাজা)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ‘‘মিসওয়াক ব্যবহারে মুখ পরিষ্কার হয় এবং তা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে’’ এবং তিনি এটিকে সুন্নাতের একটি অংশ করেছেন। বাইরের ও ভিতরের সত্তা উভয়ের জন্য এটি উপকারী যা বুদ্ধিমান লোকেরা গুনে শেষ করতে পারবে না। খাবার ও পানীয়ের কারণে দাঁতের যে রঙ বদলায় তা যেভাবে তুমি দূর কর সেভাবে তুমি তোমার অন্যায় কর্মকান্ডের অপবিত্রতা দূর কর বিনীত অনুরোধ, বিনয়, রাত্রের নামায এবং সূর্য ওঠার আগে ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে। পবিত্র করো তোমার বাইরের সত্তাকে নাপাকি থেকে এবং তোমার ভেতরের সত্তাকে বিরোধিতার ময়লা- কাদা এবং যে কোন হারাম কাজ করা থেকে; আর একই সময়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য বিশুদ্ধ চিত্তে কাজ করে। রাসূলুল্লাহ (সা.)এর (মিসওয়াক) ব্যবহারকে একটি উদাহরণ হিসাবে উপস্থিত করেছেন সাবধান ও মনোযোগী লোকদের জন্য। মিসওয়াক হচ্ছে একটি পরিষ্কার, নরম চারা এবং একটি বরকতপূর্ণ গাছের সরু ডাল। দাঁতগুলোকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সৃষ্টি করেছেন মুখের ভিতরে খাবার খাওয়ার যন্ত্র হিসাবে এবং চিবানোর মাধ্যম হিসাবে, খাবার খাওয়ার আনন্দের কারণ হিসাবে এবং অন্ত্রকে সুস্থ রাখার জন্য। দাঁতগুলো হচ্ছে খাঁটি মুক্তা, যেগুলো ময়লা হয়ে যায় খাবার চিবানোর সময় উপস্থিত থাকার কারণে, যা মুখের ভিতরে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে এবং মাড়িতে ক্ষয়ের সৃষ্টি করে।

যখন বুদ্ধিমান বিশ্বাসী নরম ডাল দিয়ে পরিষ্কার করে এবং একে খাঁটি মুক্তার উপরে বোলায় তখন সে তাদের ক্ষয় ও পরিবর্তন দূর করে এবং তাদেরকে আদি অবস্থায় নিয়ে যায়।

এরকমভাবেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অন্তরকে পবিত্র ও পরিষ্কার করে সৃষ্টি করেছেন এর খাদ্য হিসাবে দিয়েছেন যিকর (স্মরণ), গভীর ভাবনা, ভয় ও শ্রদ্ধাকে। যখন পবিত্র অন্তর উদাসীনতা এবং বিরক্তির কারণে ধূসর হয়ে যায় তখন তা চকচকে করা যায় তওবার বার্নিশের মাধ্যমে এবং পরিষ্কার করা যায় অনুতাপের পানি দিয়ে যেন তা ফিরে যায় তার আদি অবস্থায় ও মৌলিক সত্তায়। যেরকম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)

''নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন যারা তাঁর দিকে ফিরে আসে এবং তিনি তাদেরকে ভালোবাসেন যারা নিজেদেরকে পবিত্র করে।'' (সূরা বাকারাঃ ২২২)

রাসূল (সা.) মিসওয়াক ব্যবহারের উপদেশ দিয়েছেন যেন তা দাঁতগুলোর উপর ব্যবহার করা হয়; কিন্তু তিনি আরও যে অর্থ বুঝিয়েছেন তা উপরের উদাহরণে আমরা উল্লেখ করেছি, তা এ কারণে যে যদি কোন ব্যক্তি বাইরের উদাহরণ থেকে ভিতরের শিক্ষা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে মনকে অন্য চিন্তা থেকে মুক্ত করে বিশ্বাসের নীতি ও মূল- এর বিষয়ে, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা প্রজ্ঞার ঝর্নাগুলো খুলে দিবেন এবং তাঁর উপচে পড়া দান থেকে তাকে আরও দিবেন, কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের পুরস্কারে অবহেলা করেন না যারা ভালো কাজ করে।

শৌচাগার ব্যবহার

আরবীতে শৌচাগারকে বলা হয় 'বিশ্রামের স্থান', কারণ সেখানে মানুষ অপবিত্রতার বোঝা থেকে বিশ্রাম পায় এবং নিজেদেরকে নোংরা ও ময়লা থেকে খালি করে। সেখানে একজন বিশ্বাসী চিন্তা করতে পারে সে কীভাবে খাবার ও এ পৃথিবীর ক্ষয়িষ্ণু জিনিস থেকে নিজেকে পরিষ্কার করে এবং কীভাবে তার মৃত্যু আসবে একই ভাবে : অতএব সে স্বাচ্ছন্দ খুঁজে পাক এ পৃথিবীকে

এড়িয়ে যাওয়াতে, একে পাশে সরিয়ে রাখতে এবং তার নিজেকে ও তার অন্তরকে এর মনোযোগ কাড়া থেকে মুক্ত করতে । তার উচিত এ পৃথিবীকে নেয়া ও জড়ো করাকে ঘৃণা করা যেভাবে সে ঘৃণা করে অপবিত্রতা, শৌচাগার এবং নোংরাকে, এ কথা ভেবে যে কীভাবে একটি জিনিস এক অবস্থায় ভালো এবং অন্য অবস্থায় ঘৃণ্য হয়ে যায়। সে জানে সন্তুষ্টি ও সতর্কতা ধরে রাখা তাকে দুই পৃথিবীতেই আরাম এনে দেবে।

এভাবে আরাম আসে এ পৃথিবীকে তুচ্ছ ভেবে, এর আনন্দ ফুর্তিকে ত্যাগ করে এবং যা হারাম ও সন্দেহজনক তার অপবিত্রতা দূর করে। একজন ব্যক্তি নিজের উপরে গর্বের দরজাকে বন্ধ করে দেয় যখন সে তা বুঝতে পারে। সে অন্যায় কাজ থেকে পালায় এবং দরজা খুলে দেয় বিনয়, অনুতাপ ও মধ্যপন্থার জন্য। সে সংগ্রাম করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আদেশ ও নিষেধ মানতে, উত্তম পরিণতি ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নৈকট্যের সন্ধানে। সে নিজেকে বন্দী করে ভয় ও দৃঢ়তা এবং ক্ষুধাগুলোকে নিয়ন্ত্রণের কারাগারে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে পৌঁছে যায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নিরাপদ আশ্রয়ে – আসন্ন পৃথিবীতে এবং তাঁর সন্তুষ্টির স্বাদ গ্রহণ করে। যদি এটি হয় তার উদ্দেশ্য, তাহলে তার কাছে বাকী সব কিছুর কোন অর্থ নেই।

পরিচ্ছেদ- ১৬

পবিত্রতা অর্জন

যদি তুমি পবিত্র হতে চাও এবং অযু করতে চাও, তাহলে পানির কাছে সেভাবে যাও যেভাবে তুমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার রহমতের কাছে যেতে চাইতে, কারণ তিনি পানিকে তাঁর সাথে নিবিড় কথোপকথনের জন্য তাঁর কাছে যাবার চাবি বানিয়েছেন এবং একে করেছেন তাঁর দাসত্বের রাজ্যে প্রবেশ করার পথপ্রদর্শক হিসাবে। ঠিক যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার রহমত তাঁর বান্দাহদের অন্যায় কাজগুলোকে ধুয়ে মুছে দেয়, ঠিক সেভাবেই বাইরের অপবিত্রতাগুলো পরিষ্কার হয় একমাত্র পানি দিয়ে। যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا)

''তিনি বাতাসকে পাঠান সুসংবাদ হিসাবে তাঁর রহমতের আগে এবং আমরা আকাশ থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ করি।'' (সূরা ফুরকানঃ ৪৮)

অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ)

''আমরা প্রত্যেক জীবিত প্রাণীকে সৃষ্টি করেছি পানি থেকে। তাহলেও কি তারা বিশ্বাস করবে না?'' (সূরা আম্বিয়াঃ ৩০)

যেভাবে তিনি জীবন দেন প্রত্যেক নেয়ামতকে পানি থেকে, সেভাবেই তাঁর রহমত এবং উপচে পড়া দানের মাধ্যমে তিনি জীবন দেন অন্তরকে এবং আনুগত্যের কর্মকান্ডকে এবং এ চিন্তাভাবনাকে যে, পানির পবিত্রতা, এর পেলবতা, এর পরিচ্ছন্নতা, এর উপকারিতা এবং কীভাবে তা সব কিছুর সাথে নিরবে মিশে যায়; পানির মাধ্যমে তিনি অন্তরকে জীবন দেন যখন তুমি তোমার অঙ্গ- প্রত্যঙ্গকে পবিত্র কর যেগুলোকে পবিত্র করার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া

তায়ালা তোমাকে আদেশ করেছেন এবং যেগুলোকে তুমি ব্যবহার কর ফরজ ও সুন্নাত নামাযের সময়।

প্রত্যেক অঙ্গ থেকে আসে অনেক উপকারিতা। যখন তুমি অঙ্গ- প্রত্যঙ্গকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে তখন তাদের উপকারিতা তোমার জন্য শীঘ্র উথলে উঠবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সৃষ্টির সাথে আচরণ কর পানির মত যা সব জিনিসের সাথে মিশে যায় এবং যা প্রাপ্য তার সব দিয়ে দেয় অথচ তার মূল সত্তায় কোন পরিবর্তন ঘটে না। এ জিনিসটি প্রকাশ পেয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর কথায়ঃ ''আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী ব্যক্তি হলো পানির মত।'' তোমার সব আনুগত্যে আল্লাহর সাথে তোমার পবিত্রতাকে সেই পানির পবিত্রতার মত করে নাও যা তিনি আকাশ থেকে বর্ষণ করেছেন এবং একে পবিত্র আখ্যা দিয়েছেন। তোমার অন্তরকে পবিত্র করো সতর্কতা ও ইয়াক্বীন দিয়ে যখন তুমি তোমার অঙ্গ- প্রত্যঙ্গকে পবিত্র কর পানি দিয়ে।

মসজিদে প্রবেশ করা

যখন তুমি মসজিদের দরজায় পৌঁছাও জেনো যে তুমি এক মহা শক্তিধর বাদশাহর দরজায় এসেছো। শুধু পরিশুদ্ধরাই তার গালিচায় পা রাখে এবং শুধু সত্যিকার বিশ্বাসীরাই তাঁর সাথে বসার অনুমতি পায়। তাই এ মহা ক্ষমতাবান বাদশাহর দরবারে এগিয়ে যাওয়ার সময় সাবধান হও। কারণ তুমি বিরাট বিপদে পড়বে যদি তুমি উদাসীন হও। জেনে রাখো যে তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন ন্যায়বিচারে এবং উপচে পড়া নেয়ামতে – তোমাকে নিয়ে এবং তোমাকে দিয়ে। যদি তিনি তাঁর করুণা ও উপচে পড়া নেয়ামত নিয়ে তোমার দিকে ঝোঁকেন তাহলে তিনি তোমার আনুগত্যের সামান্য অংশকে গ্রহণ করেছেন এবং এর জন্য তোমাকে দিয়েছেন বিরাট পুরষ্কার। যদি তিনি তাঁর প্রতি সত্যবাদিতায় এবং আন্তরিকতায় তাঁর প্রাপ্য দাবী করেন তোমার প্রতি তাঁর ন্যায় বিচারের মাধ্যমে, তাহলে তিনি তোমাকে পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন এবং তোমার আনুগত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যদিও তোমার আনুগত্য ছিলো অনেক। তিনি করেন যা তাঁর ইচ্ছা। তাঁর সামনে তোমার অক্ষমতা, স্বল্পতা, দূর্বলতা এবং দরিদ্রতা স্বীকার করো, কারণ

তুমি তাঁর দিকে ফিরেছো তাঁর ইবাদাত করার জন্য এবং তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য। তাঁর দিকে ফিরো এবং জেনে রাখো যে, কোন প্রাণীর গোপন অথবা প্রকাশ্য বিষয়ের কোন কিছুই তাঁর কাছ থেকে লুকায়িত নয়। তাঁর সামনে তাঁর বান্দাহদের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র বান্দাহর মত হও; তোমার অন্তরকে সব চিন্তা থেকে মুক্ত করো যা তোমাকে তোমার রবের কাছ থেকে ঢেকে ফেলতে পারে। কারণ তিনি শুধু তাদেরকে গ্রহণ করেন যারা দরিদ্রতম ও সবচেয়ে আন্তরিক। দেখার চেষ্টা করো কোন খাতায় তোমার নাম লিখা হবে।

যদি তুমি তাঁর একান্ত আলাপচারিতার মিষ্টতার স্বাদ এবং তোমাকে তাঁর সম্বোধনের আনন্দ পাও এবং তাঁর রহমতের পেয়ালা থেকে পান কর এবং যে নেয়ামত তিনি তোমাকে দান করেছেন এবং তোমার যে অনুরোধগুলো তিনি গ্রহণ করেছেন, তাহলে তুমি তাঁর দাসত্ব যথাযথভাবে করেছো এবং তুমি হয়তো তাঁর অনুমতি ও নিরাপত্তা বলয়ে প্রবেশ করবে। যদি তা না হয় তাহলে তার মত দাঁড়াও যার শক্তি ও ক্ষমতা কেটে ফেলা হয়েছে এবং যার নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে এসেছে। যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা জানতে পারেন যে তোমার অন্তরে তুমি আন্তরিকভাবে তাঁর কাছে আশ্রয় চাচ্ছো তাহলে তিনি তোমাকে স্নেহ, করুণা ও দয়ার সাথে বিবেচনা করবেন। তিনি তোমাকে সে বিষয়ে সফলতা দিবেন যা তিনি ভালোবাসেন এবং যা তাঁর জন্য প্রীতিকর, কারণ তিনি উদার। তিনি ভালোবাসেন অতি উদারতা এবং তাদের ইবাদাত যারা তাঁর প্রয়োজন বোধ করে এবং যারা তাঁর দরজায় পুড়ছে তাঁর সন্তুষ্টির ভিক্ষা চেয়ে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ)

''কে দুর্দশাগ্রস্থকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং দূর করে দেন খারাপকে?'' (সূরা নামলঃ ৬২)

দোয়া

দোয়া- র সৌজন্য পালন করো। ভেবে দেখো কাকে তুমি ডাকছো, কীভাবে তাকে ডাকছো এবং কেন তাকে ডাকছো; পূর্ণব্যক্ত করো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বিশালতা ও পরম মর্যাদাকে। তোমার অন্তর দিয়ে দেখো কীভাবে তিনি জানেন তোমার বিবেকের ভিতর কী আছে, কীভাবে তিনি দেখেন তোমার গোপন সত্তাকে এবং দেখেন এতে যা ঘটে গেছে এবং যা ঘটবে – সত্য ও মিথ্যা দু'টোই। তোমার নাজাত ও তোমার ধ্বংসের পথকে জেনে নাও যেন তুমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে এমন কিছুর জন্য না ডাকো যার ভেতরে নিহিত আছে তোমার ধ্বংস অথচ তুমি মনে করছো সেখানে তোমার নাজাত রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

(وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا)

''মানুষ খারাপ- এর জন্য দোয়া করে যেভাবে তার উচিত ভালোর জন্য দোয়া করা এবং মানুষ খুব তাড়াহুড়া প্রবন।'' (সূরা বনী ইসরাইলঃ ১১)

কী তুমি চাইছো এবং কেন তা চাইছো তা নিয়ে ভাবো; দোয়া হওয়া উচিত সত্যের প্রতি তোমার পক্ষ থেকে পূর্ণ সাড়া এবং অন্তর গলে যাওয়া তোমার রবের কথা ভেবে। তার উচিত সব পছন্দ পরিত্যাগ করা এবং সব বিষয়কে আল্লাহর প্রতি সমর্পণ করা – প্রকাশ্য ও গোপন উভয়কেই। যদি দোয়ার পূর্বশর্তগুলো পালন করা না হয় তাহলে তা ক্ববুল হওয়ার কথা ভেবো না, কারণ তিনি জানেন কী গোপন ও কী লুকায়িত আছে; তুমি হয়তো তাঁর কাছে কিছু চাইছো যখন তিনি জানেন তুমি ঠিক এর উল্টোটি গোপন করছো।

সাহাবীদের একজন অন্যদের বললোঃ ''তোমরা বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করছো আর আমি অপেক্ষা করছি পাথরের (বৃষ্টি) জন্য।'' জেনে রাখো যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে আদেশ না করতেন তাকে ডাকার জন্য তিনি কখনোই আমাদের নামাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে দোয়া ক্ববুল করতেন না। তাহলে তার দান কত বড় যে তিনি সাড়া দেয়ার নিশ্চয়তা দিয়েছেন যদি কেউ দোয়ার পূর্বশর্তগুলো পূরণ করে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)- কে জিজ্ঞেস করা হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সবচেয়ে শক্তিশালী নাম কী? তিনি বললেনঃ '' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রত্যেকটি নামই সবচেয়ে শক্তিশালী।''

তোমার অন্তরকে তিনি ছাড়া আর সবকিছু থেকে মুক্ত করো এবং তাঁকে ডাকো সে নামে যা তোমার পছন্দ। বাস্তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার একটিই নাম তা নয় : তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা, এক ও সর্ব শক্তিমান।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ''আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কোন ভ্রুক্ষেপহীন অন্তরের দোয়াতে সাড়া দেন না।'' যখন তোমাদের মধ্যে কেউ চায় তার রব তাকে তা দিক যা সে তাঁর কাছ থেকে চেয়েছে তাহলে তার উচিত সব মানুষকে পরিত্যাগ করা – একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি আশা স্থাপন করা। যখন আল্লাহ তার অন্তরে সেটি দেখেন তখন তিনি তাই দিবেন যা সে চায়।

যখন তুমি দোয়ার পূর্বশর্তগুলো প্রতিষ্ঠা করেছো যা আমি উল্লেখ করেছি এবং তোমার গভীরতম সত্তার ভেতরে তাঁর জন্য আন্তরিক হয়েছো, তাহলো সুবংবাদে আনন্দ করো যে তিনটি জিনিসের যে কোন একটি ঘটবেঃ হয় তিনি দ্রুত দিবেন যা তুমি চেয়েছো অথবা তিনি তোমার জন্য তার চেয়ে ভালো কিছু জমা রাখবেন অথবা তিনি তোমার কাছ থেকে একটি দুর্দশা হটিয়ে দিবেন যা তিনি পাঠালে তোমাকে ধ্বংস করে দিতো। রাসূল (সা.) বলেছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ ''যদি কোন ব্যক্তি আমার কাছে চাওয়ার সময় আমাকেই স্মরণ করার কারণে তা ভুলে যায় তাহলে আমি তাকে তার চাইতে ভালো কিছু দিবো যা আমি তাদেরকে দেই যারা চায়।''

আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে একবার ডাকলাম এবং তিনি সাড়া দিলেন। আমি আমার প্রয়োজন ভুলে গেলাম কারণ যখন তিনি কোন দোয়ার উত্তর দেন তাঁর দান হয় আরো বড় এবং আরো উচ্চ মূল্যের তার চাইতে যা বান্দাহরা তাঁর কাছে চায়, যদি তা জান্নাত ও তার চিরস্থায়ী নেয়ামতও হয়। এটি শুধু সেই প্রেমিকরা যারা কাজ করে, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিরা, উচ্চস্থানীয়রা এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নির্বাচিত ব্যক্তিরা বুঝতে পারে ।

পরিচ্ছেদ- ১৭

রোযা রাখা

রাসূল (সা.) বলেছেনঃ ''রোযা এ পৃথিবীর দুঃখ কষ্টের বিরুদ্ধে একটি নিরাপত্তা এবং আখেরাতে শাস্তি থেকে বাঁচার পর্দা।'' যখন তুমি রোযা রাখ তখন নিয়ত করো যে এর মাধ্যমে তুমি শরীরের মাংসের ক্ষুধাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং পৃথিবীর সেসব কামনা বাসনাকে কেটে ফেলবে যা শয়তান ও তার মতদের বুদ্ধি থেকে আসে। নিজেকে একজন অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থায় রাখো যে না চায় খাবার না চায় পানি; আশা করো যেন যে কোন মুহূর্তে অন্যায় কাজের অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ করতে পারো। তোমার অভ্যন্তরীণ সত্তাকে পবিত্র করো প্রত্যেক মিথ্যা, নোংরা- কাদা, উদাসীনতা এবং অন্ধকার থেকে যা তোমাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি আন্তরিক হওয়া থেকে কেটে দেয়।

কোন এক সাহাবীকে একজন বলেছিলোঃ ''তুমি ইতোমধ্যেই দূর্বল, রোযা তোমাকে আরও দূর্বল করে দেবে।'' সে বললোঃ ''আমি এ রোযাকে প্রস্তুত করছি এক লম্বা দিনের খারাপ- এর বিরুদ্ধে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে মেনে চলার পথে ধৈর্য তাঁর শাস্তিতে ধৈর্য ধরার চাইতে উত্তম।'' রাসূলুল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কথা উদ্ধৃত করেছেনঃ (.সা)''রোযা আমার জন্য রাখা হয় এবং আমি এর প্রতিদান।''

রোযা নফসের কামনা- বাসনা এবং লোভের ক্ষুধাকে হত্যা করে এবং এ থেকে আসে অন্তরের পবিত্রতা, অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের পরিশুদ্ধতা, ভিতরের ও বাইরের সত্তার আবাদ, নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা, দরিদ্রের জন্য দান, বিনয়পূর্ণ প্রার্থনার বৃদ্ধি, অন্তর গলে যাওয়া, কান্না এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে আশ্রয় নেয়ার সব পথ। এটি উচ্চাশা ভঙ্গের, খারাপ জিনিসগুলোর বোঝা লাঘব এবং ভালো কাজ দ্বিগুণ হওয়ার কারণ। এর ভেতরে এত নেয়ামত যে তা গোনা যায় না। এটি যথেষ্ট যে আমরা সেগুলোর কিছু উল্লেখ করেছি সে ব্যক্তির জন্য যে

বোঝে এবং যাকে রোযার কল্যাণ লাভে সফলতা দেয়া হয়েছে, যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইচ্ছা করেন।

বিরত থাকা

‘বিরত থাকা’ হলো আখেরাতের চাবি এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি। এর ভেতরে আছে যা কিছু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দিক থেকে তোমার মনোযোগ কেড়ে নেয় কোন দুঃখ ছাড়া সেসব পরিত্যাগ করে গর্ব বোধ না করা, বা তা পরিত্যাগ করার কারণে স্বস্তি লাভের অপেক্ষা না করা এবং তার জন্য কোন প্রশংসা না খোঁজা। নিশ্চয়ই বিরত থাকা অর্থ হচ্ছে এসব জিনিসকে ব্যক্তি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় মনে করেঃ সে মনে করে এগুলো তার পাশ কাটিয়ে যাওয়া তার জন্য স্বস্তি ও আরাম, এবং তাদের উপস্থিতি তার জন্য দুর্ভোগ; এভাবে সে সবসময় দুর্ভোগ থেকে পালায় এবং যা তাকে স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বস্তি এনে দেয় তার সাথে লেগে থাকে। যে ব্যক্তি বিরত থাকে সে আখেরাতকে বেছে নিয়েছে। সে বেছে নিয়েছে শক্তি ও এ পৃথিবীর বদলে মর্যাদাশূন্যতাকে, বিশ্রামের বদলে সংগ্রামকে, ভর পেটের বদলে ক্ষুধাকে, তার কল্যাণ যা আসবে নিকট পরীক্ষার পর দেরীতে এবং ভ্রুক্ষেপহীনতার বদলে স্মরণকে। তার সত্তা এ পৃথিবীতে আর তার অন্তর আখেরাতে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ‘‘এ পৃথিবীর ভালোবাসা প্রত্যেক ভুলের ঝর্না’’ এবং অন্য জায়গায় বলেছেনঃ ‘‘এ পৃথিবী একটি লাশ, যে একে চায় সে একটি কুকুরের মত।’’ তুমি কি দেখো না তা কীভাবে তা ভালোবাসে যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ঘৃণা করেন? এ ভুলের চেয়ে বড় অপরাধ আর কী আছে?

রাসূলুল্লাহর (সা.) পরিবারের একজন বলেছেনঃ ‘‘যদি এ সম্পূর্ণ পৃথিবী একটি শিশুর মুখের ভেতরে একটি লোকমা হতো তাহলে আমরা তার উপরে করুণা করতাম। তাহলে তার অবস্থা কী যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সীমানাকে পিছনে ছুঁড়ে ফেলে এ পৃথিবীকে চায় ও আকাঙ্ক্ষা করে? যদি এ পৃথিবীতে থাকার জায়গা ভালো হতো তাহলে তা তোমাকে করুণা করতো না, না তোমার ডাকে সাড়া দিতো এবং না তোমাকে প্রস্থানের সময় বিদায় সম্বর্ধনা জানাতো।’’

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ‘‘যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই পৃথিবী সৃষ্টি করলেন তিনি একে আদেশ করলেন তাকে মানার জন্য এবং সে তার রবকে মান্য করলো। তিনি একে বললেনঃ তার বিরোধিতা করো যে তোমাকে চায় এবং তাকে সফলতা দাও যে তোমার বিরোধিতা করে।’’ এটি তাই করে যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা একে করতে দায়িত্ব দিয়েছেন এবং তিনি যা এর প্রকৃতির উপরে ছাপ মেরে দিয়েছেন।

এ পৃথিবীর একটি বর্ণনা

এ পৃথিবী একটি দেহের মত যার মাথা হচ্ছে অহংকার, যার চোখগুলো হচ্ছে সম্পদের তীব্র লালসা, যার কানগুলো হচ্ছে লোভ, যার জিহবা হচ্ছে প্রতারণা, যার হাত হচ্ছে আশা, যার পাগুলো হচ্ছে আত্ম- অহংকার, যার অন্তর হচ্ছে উদাসীন, যার সত্তা হচ্ছে ধ্বংস, যার উৎপাদিত পণ্য হলো চিরতরে হারিয়ে যাওয়া। যে একে ভালোবাসে এটি তাকে অহংকার এনে দেয়, যে একে পছন্দ করে তাকে সম্পদের তীব্র লোভ এনে দেয়, যে একে চায় তাকে লোভ এনে দেয় এবং যে একে প্রশংসা করে তাকে মোনাফেক্বীর পোষাক পরিয়ে দেয়। যে একে আশা করে তাকে আত্ম- অহংকারের শক্তি এনে দেয়; যে এর উপর নির্ভর করে তার ভিতরে উদাসীনতা সৃষ্টি করে। যে এর ভালোকে প্রশংসা করে এটি তাকে লোভ দেখিয়ে ফাঁদে ফেলে, কিন্তু ঐসব ভালো তার জন্য টিকে থাকে না। যে ব্যক্তি একে জমা করে এবং একে নিয়ে কৃপণতা করে এটি তাকে ফেরত পাঠায় তার নিজ ঠিকানায় যা হলো জাহান্নামের আগুন।

পরিচ্ছেদ- ১৮

কাজ করায় অনীহা

যে ব্যক্তি কাজ করতে অনীহা বোধ করে সে কাজ শুদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়, যদি এমনও হয় সে ভালো কাজ করে; আর যে ব্যক্তি সেচ্ছায় কাজ করে সে শুদ্ধ, সে ভুল করলেও। অনীহাপূর্ণ ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত ঘৃণা কুড়ায় এবং কাজ করার সময় সে মানসিক ক্লান্তি, পরিশ্রম এবং দুর্দশায় পড়ে। অনীহাপূর্ণ ব্যক্তির বাইরের সত্তা লোক দেখানো এবং তার অভ্যন্তরীন সত্তা হলো কপটতাঃ এগুলো তার পাখা যা দিয়ে সে উড়ে। অনীহাপূর্ণ ব্যক্তির ভেতরে কখনোই সৎকর্মশীলদের কোন গুণাবলী থাকে না, আর না থাকে বিশ্বাসীদের কোন নিদর্শন, সে যেখানেই থাকুক।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর রাসূলকে (সা.) বলেছেনঃ

(قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ)

‘বলো, আমি এর জন্য কোন পুরস্কার চাই না; না আমি তাদের একজন যারা অনীহা নিয়ে কাজ করে।’’ (সূরা সাদঃ ৮৬)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ‘‘আমরা নবীরা (সা.) ভয়ের সাথে সচেতন, আমানত বহনকারী, আমরা অনীহাপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি।’’ তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে ভয় করো এবং কাজে অনীহাকে বিদায় করে দাও এবং এটি তোমার উপর বিশ্বাসের চিহ্ন এঁকে দেবে। তা নিয়ে ব্যস্ত থেকো না যার পোষাক হচ্ছে দুঃখ- কষ্ট এবং খাবার নিয়ে যা শেষ পর্যন্ত খালি হয়ে যাবে, কোন বাসস্থান নিয়ে যার শেষ হচ্ছে ধ্বংস, সম্পদ নিয়ে যার শেষ হলো অন্য কেউ এর উত্তরাধিকারী হবে, সাথীদের নিয়ে – শেষ পর্যন্ত যাদের কাছ থেকে অবশ্যই ছুটি নিতে হবে, সম্মান নিয়ে যার শেষে আছে মর্যাদাশূন্যতা, আনুগত্য নিয়ে যার শেষ হলো পরিত্যক্ত হওয়া অথবা একটি জীবন নিয়ে যার শেষ হলো দুঃখ।

ধোঁকা

যে ব্যক্তি ধোঁকা খেলো সে এ পৃথিবীতে হতভাগ্য এবং আখেরাতে প্রতারিত, কারণ সে উত্তমকে বিক্রি করেছে অধমের বিনিময়ে। নিজেকে প্রশংসার চোখে দেখো না। কোন কোন সময় তুমি প্রতারিত হতে পারো তোমার সম্পত্তি ও শারীরিক স্বাস্থ্যের কারণে এ ভেবে যে তুমি চিরদিন টিকে থাকবে। কোন কোন সময় তুমি ধোঁকা খাও তোমার দীর্ঘ জীবন, তোমার সন্তান- সন্ততি এবং বন্ধুদের কারণে যেন তুমি এগুলোর কারণে রক্ষা পাবে। কোন কোন সময় তুমি ধোঁকা খাও তোমার সৌন্দর্য্য দেখে এবং তোমার জন্মের সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিয়ে, যা তোমাকে আশা ও আকাঙ্ক্ষা জোগায় এত সহজেই যে তুমি ভাবো তুমি সত্যবাদী ও তোমার লক্ষ্য অর্জনে সফল । কোন কোন সময় তুমি ধোঁকা খাও অন্যদের সামনে তোমার ইবাদাতের ত্রুটিগুলো নিয়ে দুঃখ করে, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা জানেন ঠিক এর উল্টোটি আছে তোমার অন্তরে। কোন কোন সময় তুমি নিজেকে ইবাদাত করতে বাধ্য কর অনীহা থাকাকালে; অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা চান ইখলাস (আন্তরিকতা)। মাঝে মাঝে তুমি মনে কর তুমি আল্লাহকে ডাকছো অথচ তুমি ডাকছো অন্যকে । কখনো তুমি মনে কর তুমি লোকজনকে ভালো উপদেশ দিচ্ছো অথচ তোমার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে যে তারা তোমার প্রতি মাথা নত করুক। কোন কোন সময় তুমি নিজেকে দোষারোপ কর অথচ প্রকৃতপক্ষে তুমি নিজের প্রশংসা করছো।

জেনে রাখো তুমি তখনই শুধু ধোঁকা ও আকাঙ্ক্ষার অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসবে যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি ফিরবে আন্তরিক ভাবে অনুতপ্ত হয়ে, তাঁর বিষয়ে তুমি যা কিছু জানো তার দিকে এবং তোমার নিজের ভেতরের সেই ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করতে পারবে যা তোমার বুদ্ধি ও জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং যা ঈমান, আইন (শারীয়াহ), রাসূল (সা.)- এর সুন্নাহ এবং হেদায়াতের ইমামরা সহ্য করেন না।

যদি তুমি তোমার বর্তমান অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো, তাহলে তোমার চেয়ে জ্ঞান ও কাজকর্মে বেশী হতভাগ্য আর নেই; না আছে কারও এর চেয়ে অর্থহীন জীবন। তুমি ক্বিয়ামাতের দিনে উত্তরাধিকার হিসাবে শুধু দুঃখই পাবে।

মোনাফিক্বদের বর্ণনা

মোনাফিক্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার রহমত থেকে বহু দূরে থাকার কারণে সন্তুষ্ট থাকে, কারণ তার বাইরের কর্মকান্ড ইসলামী আইন অনুযায়ী থাকে, কিন্তু এর পরেও সে ভ্রুক্ষেপহীন এবং নিষ্ফল টিটকারী করে এবং তার অন্তরে এর সত্যতার সীমালংঘন করে ।

মোনাফেক্বীর চিহ্ন হচ্ছে মিথ্যাকে কিছু মনে না করা, প্রতারণা, ঔদ্ধত্য, মিথ্যা দাবী, আন্তরিকতাহীনতা, নির্বুদ্ধিতা, ভুল এবং বিনয়ের অভাব, অবাধ্যতাকে হালকা করে দেখানো, বিশ্বাসীরা যেন বিশ্বাস হারায় তা চাওয়া, এবং বিশ্বাসে দুর্দশাকে হালকা করে দেখানো, অহংকার, প্রশংসা, প্রেমের প্রশংসা, প্রশংসাকে ভালোবাসা, ঈর্ষা, আখেরাতের চাইতে পৃথিবীকে এবং খারাপকে ভালোর চাইতে পছন্দ করা, অপবাদ দেয়াতে উস্কানী দেয়া, আনন্দ-ফুর্তিকে ভালোবাসা, কথায় যারা শঠ তাদের সাথে লেনদেন করা, উদ্ধত লোকদের ভালো কাজ এড়িয়ে যাওয়াতে সাহায্য করা, যারা ভালো কাজ করে তাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, মোনাফিক্ব যে খারাপ কাজ করে তাকে ভালো মনে করা এবং অন্যলোক যা ভালো করে তাকে ঘৃণ্য মনে করা এবং এরকম আরো অনেক জিনিস।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মোনাফিক্বদের বেশ কয়েক জায়গায় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

(وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ)

''এবং মানুষের মাঝে সে আছে যে আল্লাহর দাসত্ব করে কিনারে দাঁড়িয়ে। এতে যদি তার কোন কল্যাণ হয় সে এতে সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু কোন পরীক্ষা তাকে কষ্ট দিলে সে উল্টো দিকে ফিরে যায়; সে হারায় এ দুনিয়া ও আখেরাত; আর এটিতো স্পষ্ট ক্ষতি।'' (সূরা হাজ্জঃ ১১)

তাদের বর্ণনা করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

(وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ)

''কিছু মানুষ আছে যারা বলেঃ 'আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহতে এবং আখেরাতে।' কিন্তু তারা মোটেও বিশ্বাসী নয়। তারা চায় আল্লাহ ও বিশ্বাসীদের ধোঁকা দিতে, কিন্তু তারা শুধু নিজেদের ধোঁকা দেয় অথচ তারা তা বোঝে না। তাদের অন্তরগুলোতে একটি রোগ আছে, তাই আল্লাহ তাদের রোগ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।'' (সূরা বাকারাঃ ৮- ১০)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ''মোনাফিক্ব সে, যে প্রতিশ্রুতি দেয়ার পরে তা ভাঙ্গে; যখন সে কোন কাজ করে সে খারাপ কাজ করে; যখন সে কথা বলে, সে মিথ্যা বলে; যখন তাকে বিশ্বাস করা হয় সে বিশ্বাসঘাতকতা করে; যখন তাকে রিযক দেয়া হয়, সে হয় লাগামহীন; যখন তা স্থগিত রাখা হয় তখন সে তার জীবন নিয়ে অনেক বড় কথা বলে।''

তিনি আরো বলেছেনঃ ''যে ব্যক্তির গভীরতম সত্তা তার প্রকাশ্য চেহারার বিরোধিতা করে সে মোনাফিক্ব – সে যেই হোক, যেখানেই সে থাকুক, যে যুগেই সে বাস করুক এবং যে পদমর্যাদাই তার থাকুক।''

সঠিক সামাজিক লেনদেন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অবাধ্য না হয়ে তাঁর সৃষ্টির সাথে সঠিক আচরণ আসে তাঁর বান্দাহদের উপর তাঁরই নেয়ামতের বৃদ্ধি থেকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি অন্তরে বিনয়ী সে প্রকাশ্যে ভালো আচরণ করে।

লোকজনের সাথে ভালো আচরণ করো আললাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কারণে, এ পৃথিবী থেকে কোন অংশ পাওয়ার জন্য নয় অথবা সম্মানের খোঁজে নয় অথবা লোক দেখানোর জন্য অথবা তোমার খ্যাতি বৃদ্ধির জন্য নয়।

আইনের সীমা লংঘন করো না মর্যাদা ও সুখ্যাতি চেয়ে; এগুলো তোমাকে কোন লাভ এনে দেবে না এবং তুমি আখেরাত হারাবে কোন লাভ ছাড়াই।

দেয়া ও নেয়া

যে ব্যক্তি দেয়ার চাইতে নেয়াকে বেশী পছন্দ করে সে প্রতারিত হয়েছে, কারণ তার ভ্রুক্ষেপহীন স্বভাবের কারণে সে মনে করে যে, ‘যা এখন তা পরে যা আসবে তার চাইতে উত্তম’। বিশ্বাসীর জন্য এটিই শোভা পায় যে যখন সে কিছু নিবে তা সে বৈধভাবে নিবে। যদি সে দেয় তাহলে তা হওয়া উচিত যথার্থ কারণে, বৈধভাবে এবং তার বৈধ সম্পদ থেকে। কত গ্রহণকারীই না তার ঈমানকে ত্যাগ করে, অথচ সে সম্পর্কে খবর রাখে না! যারা দেয় তাদের কত জনই না নিজের উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার গযব ডেকে আনে!

বিষয়টি শুধু দেয়া ও নেয়ার প্রশ্ন নয় বরং সে ব্যক্তি রক্ষা পেলো যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে দেয়া ও নেয়ার সময় ভয় করলো এবং যে সৎকর্মশীলতার রশিকে শক্ত করে ধরে রাখে।

এ বিষয়ে মানুষ দুই শ্রেণীরঃ উচ্চ শ্রেণী ও সাধারন। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা কষ্টকর সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে এবং নেয় না যতক্ষণ না সে নিশ্চিত হয় যে তা অনুমোদিত। যদি তা তার কাছে স্পষ্ট না হয় তাহলে সে শুধু তখনই নিবে যখন তা অত্যন্ত জরুরী। সাধারণ ব্যক্তি শুধু বাইরের দিকটি বিবেচনা করে; সে তা নেয় যা সে দেখে চুরি করা নয় অথবা জবরদস্তির সাথে নেয়া হয় নি এবং বলে, ‘এতে কোন ক্ষতি নেই; এটি আমার জন্য অনুমোদিত।’ এখানে বিষয়টি পরিষ্কার যে সে তা নেয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার রায় থাকার কারণে এবং খরচ করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য।

পরিচ্ছেদ- ১৯

ভ্রাতৃত্ববোধ

তিনটি জিনিস প্রত্যেক যুগেই বিরল : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কারণে ভ্রাতৃত্ব; একজন ধার্মিক স্নেহশীল স্ত্রী যে তোমাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি বিশ্বাসে সাহায্য করে এবং একজন হেদায়েতপ্রাপ্ত পুত্র সন্তান। যে এ তিনটি জিনিস পায় সে দুই জগতের কল্যাণ লাভ করেছে এবং এ পৃথিবীর ও আখেরাতের পূর্ণ অংশ পেয়েছে। কোন ব্যক্তিকে ভাই হিসাবে নেয়াতে সাবধান থাকো যখন তুমি লোভ, ভয়, ঝোঁক, টাকা- পয়সা, খাবার ও পানির কারণে উদ্যোগী হয়েছো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কারণে ও তাকে ভয় করে ভ্রাতৃত্ব খোঁজ করো যদি তা পৃথিবীর আরেক প্রান্তেও হয় এবং যদি তার খোঁজে তোমার সারা জীবনও ব্যয় করে ফেলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এ পৃথিবীর উপরে রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর পরে তাদের চাইতে ভালো কাউকে রাখেন নি, না তিনি কোন বান্দাহকে দিয়েছেন তাদের খুঁজে পাওয়ার সফলতার মত কোন নেয়ামত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ)

''বন্ধুরা সেদিন হবে পরস্পরের শত্রু শুধু তারা ছাড়া যারা সতর্ক পাহারা দেয় (অন্যায়ের বিরুদ্ধে)।'' (সূরা যুখরুফঃ ৬৭)

আমি বিশ্বাস করি আজকাল যদি কেউ ত্রুটিবিহীন বন্ধু খোঁজে তাহলে সে বন্ধুবিহীন অবস্থায় থাকবে। তুমি কি দেখো না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর রাসূলের (সা.) উপর প্রথম যে সম্মানের চিহ্ন এঁকে দিয়েছেন, তাহলো একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ও সাহায্যকারী ঈমানের দিকে তাদের আহবানের কথা জানাজানি হওয়ার পর। [ইমাম আলী (আ.)]। (অনুবাদক)

একইভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সবচেয়ে বেশী ঐশী মূল্যের যে উপহার তাঁর বন্ধুদের, সমর্থকদের (আউলিয়া), বিশুদ্ধ বন্ধুদের এবং ওয়াসীদের দিয়েছেন তাহলো তাঁর রাসূলের (সা.)

সাহচর্য। এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সম্পর্কে জ্ঞান- এর পরে দুই জগতের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কারণে সাহচর্য ও তাঁর জন্য ভ্রাতৃত্বের চেয়ে বেশী ঐশী মূল্যের, এর চেয়ে বেশী ভালো অথবা এর চেয়ে বেশী পবিত্র কোন নেয়ামত নেই।

পরামর্শ

ঈমান তোমার কাছে যা দাবী করে সে বিষয়ে পরামর্শ করো তার সাথে যার এ পাঁচটি গুণ আছেঃ বুদ্ধি, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, সৎ উপদেশ এবং তাক্বওয়া (সতর্কতা) । যদি তুমি এ পাঁচটি জিনিস কোন ব্যক্তির ভেতর পাও তাহলে সে সুযোগ কাজে লাগাও, দৃঢ় হও এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর নির্ভর করো।

এটি তোমাকে যা সঠিক সেখানে নিয়ে যাবে ।

আর যেসব বিষয় এ পৃথিবীর এবং তা ঈমানের সাথে সম্পর্কিত নয়, এগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নাও এবং এরপর এগুলো সম্পর্কে আর চিন্তা করো না। তাহলে তুমি রিযক- এর বরকত এবং আনুগত্যের মিষ্টতা লাভ করবে।

জ্ঞান অর্জিত হয় আলোচনার মাধ্যমে। বুদ্ধিমান সে যে নুতন জ্ঞান লাভ করে আলোচনার মাধ্যমে এবং তা তাকে তার লক্ষ্য অর্জনে পথ দেখায়। উপযুক্ত পরামর্শদাতার সাথে আলোচনা করা হলো আকাশগুলো ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এ দু'য়ের ধ্বংসের উপর গভীরভাবে ভাবার মত, কেননা ব্যক্তির ভাবনা যত গভীর ও প্রখর হয় এ দু'য়ের উপর মারেফাতের নূরের তত গভীরে সে প্রবেশ করে এবং তা তার বুঝকে এবং ইয়াক্বীনকে বৃদ্ধি করে।

তার কাছ থেকে কোন উপদেশ নিও না যাকে তোমার বুদ্ধি সায় দেয় না, যদি সে তার সূক্ষ্ম আলোচনা ও সুক্ষ্ম বাছ বিচারের জন্য বিখ্যাতও হয়। যখন তুমি তার কাছ থেকে উপদেশ নাও যাকে তোমার অন্তর বিশ্বাস করে, তাহলে সে যে উপদেশ দেয় তার সাথে দ্বিমত হয়ো না, যদিও তুমি যা চাও তা তার বিপরীতও হয়। নিশ্চয়ই নফস সত্যকে গ্রহণ ও এর বিপরীতকে একত্রে ধারণ করে; আর তাহলো সে অন্য সত্যগুলোও গ্রহণ করে যা তার কাছে আরো স্পষ্ট। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)

''তাদের সাথে পরামর্শ করো (প্রয়োজনীয়) বিষয়ে।'' (সূরা আলে ইমরানঃ ১৫৯)

এবং আরও বলেছেনঃ

(وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ)

‘‘তাদের নিয়ম হলো তাদের নিজেদের মাঝে পরামর্শ করা।’’ (সূরা শূরাঃ ৩৮)

অর্থাৎ তারা এ বিষয়ে পরামর্শ করে।

সহনশীলতা

সহনশীলতা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার একটি প্রদীপ যা বহনকারীকে তাঁর (দেয়া) উচ্চ মর্যাদায় নিয়ে যায়, কোন ব্যক্তি সহনশীল হতে পারে না যদি না তাকে মারেফাতের নূর এবং তাওহীদ দেয়া হয়। সহনশীলতার চারটি দিক রয়েছেঃ যখন কোন মানুষকে প্রশংসা করা হয় কিন্তু এরপর তাকে নীচুতে নামানো হয়; যখন সে সত্যবাদী তখন তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়; যখন সে মানুষকে সত্যের দিকে ডাকে তখন তাকে তিরস্কার করা হয়; সে কোন অপরাধ করা ছাড়াই আহত হয় এবং সে যখন তার অধিকার দাবী করে তখন তারা তার বিরোধিতা করে।

যখন এগুলোর প্রত্যেকটিকে তুমি প্রাপ্য অংশ দিয়েছো তখন তুমি লক্ষ্য অর্জন করেছো। যখন তুমি অর্ধেক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছো এবং তাকে কোন উত্তর দাও নি তখন লোকজন তোমার সাহায্যে এগিয়ে আসবে, কারণ যে ব্যক্তি নির্বোধ লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সে আগুনে কাঠ দেয়।

রাসূল (সা.) বলেছেনঃ ''বিশ্বাসী হচ্ছে পৃথিবীর মাটির মত; মানুষ তা থেকে উপকারিতা লাভ করে যখন তারা এর উপরে থাকে।'' যে লোকজনের দুর্ব্যবহার সহ্য করতে পারে না সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে না, কারণ তাঁর সন্তুষ্টি সাধারণ মানুষের অপছন্দের সাথে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত।

বর্ণিত আছে যে এক ব্যক্তি আহনাফ ইবনে ক্বায়েসকে বললোঃ ''তুমি আমাকে দুঃশিন্তায় ফেলে দিচ্ছো।'' সে উত্তরে বললোঃ ''আমি তোমার সাথে সহনশীল থাকবো।''

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ আমাকে পাঠানো হয়েছে সহনশীলতার কেন্দ্র, জ্ঞানের খনি এবং ধৈর্যের বাড়ি হিসেবে।'' তিনি সত্য বলেছেন যখন বলেছেনঃ ''সত্যিকার সহনশীলতা হলো যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দাও যখন সে তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে এবং তোমার বিরোধিতা করে অথচ তোমার শক্তি আছে তার উপরে প্রতিশোধ নেয়ার।'' যেভাবে দোয়াতে

বলা হয়েছেঃ ‘‘হে আমার আল্লাহ, আপনি দানে ও সহনশীলতায় খুব বেশী প্রশস্ত আমার কর্মকান্ডের জন্য আমাকে শাস্তি দেয়া এবং আমার ভুলের জন্য আমাকে বেইযযতি করার চেয়ে।’’

অন্যদের উদাহরণ অনুসরণ করা

অন্যের উদাহরণ অনুসরণ করা এর চাইতে বেশী কিছু নয় যা রুহকে দান করা হয়েছিলো তার শুরুতে, যখন সময়ের নূরকে মিশ্রিত করা হয়েছিলো চিরকালের নূরের সাথে। কোন নমুনাকে অনুসরণ করা বাইরের ক্রিয়াকলাপকে গ্রহণ করা বোঝায় না, এটি ধর্মের প্রজ্ঞাবানদের মাঝে আউলিয়া ও ইমামদের (আ.) সাথে পার্থক্য দাবী করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ)

''সেদিন আমরা প্রত্যেক জাতিকে তাদের ইমামসহ ডাকবো।'' (সূরা বনী ইসরাইলঃ ৭১)

অর্থাৎ যে নিজেকে অস্বীকার করে অন্য কারোঅন্তরের অনুসরণ করে সে পবিত্র। অন্য [1] জায়গায় বলেছেনঃ

(فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ)

''যখন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, সেদিন তাদের নিজেদের মধ্যে আর কোন সম্পর্কের বন্ধন থাকবে না, না তারা কেউ কারও সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে।'' (সূরা মূমিনূনঃ ১০১)

আমিরুল মুমিনীন বলেছেনঃ ''আত্মাগুলো এক একটি সৈন্যদল। যারা পরস্পরকে জানে তারা ঘনিষ্ট এবং যারা পরস্পরকে জানে না তারা পরস্পর দ্বিমত পোষণ করে।'' মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়াকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো কে তাকে ভালো আচরণ শিখিয়েছে। সে বলেছিলোঃ ''আমার রব আমাকে সু- আচরণ শিখিয়েছেন আমার ভিতরে। বুদ্ধিমান ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের মাঝে আমি ভালো যা দেখি তাই আমি অনুসরণ করি এবং ব্যবহার করি; মুর্খলোকদের মাঝে আমি যা ঘৃণ্য দেখি তা আমি এড়িয়ে যাই ও চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করি। আর তা আমাকে জ্ঞানের পথে এনেছে। দৃঢ় বিশ্বাসীর জন্য অন্যদের উদাহরণ অনুসরণ করার চেয়ে নিরাপদ আর কোন পথ নেই, কারণ তা হচ্ছে সবচেয়ে স্পষ্ট পথ এবং ত্রুটিহীন লক্ষ্য।'' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মাদকে (সা.) বলেছেনঃ

(أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ)

‘‘এরাই তারা যাদের আল্লাহ পথ দেখিয়েছেন। অতএব তাদের হেদায়েত অনুসরণ করো।’’ (সূরা আনআমঃ ৯০)

অন্য জায়গায় তিনি বলেছেনঃ

(ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)

‘‘এরপর তোমার কাছে আমরা ওহী পাঠালামঃ হানিফ (আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ) ইবরাহীমের বিশ্বাসকে আনুসরণ করো।’’ (সূরা নাহলঃ ১২৩)

যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ধর্মতে একটি নমুনার অনুসরণের চাইতে আরও সরল সোজা কোন পথ থাকতো তাহলে তা তিনি তাঁর রাসূল (সা.) এবং তার সমর্থকদের জন্য উল্লেখ করতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : ‘‘অন্তরে একটি নূর (আলো) আছে যা জ্বলে উঠে শুধু সত্যকে অনুসরণ করলে এবং সত্য পথের দিকে যেতে চাইলে’’ এটি রাসূল (সা.)- এর নূরের একটি অংশ যা বিশ্বাসীদের অন্তরে আমানত দেয়া হয়েছে।

পরিচ্ছেদ- ২০

ক্ষমা

ক্ষমতা থাকা সত্তেও কাউকে ক্ষমা করে দেয়া হচ্ছে রাসূলদের (আ.) এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে যারা ভয় করে তাদের গোপন রহস্য। ক্ষমা হলো তা যখন তুমি তোমার সাথীকে বাহ্যিকভাবে সে যে অন্যায় করেছে তার জন্য তাকে অভিযুক্ত কর না, যখন তুমি সেই কারণকে ভুলে যাও যা ভেতরে কষ্টের সৃষ্টি করেছে এবং যখন তুমি তোমার পছন্দে বিরাট উদারতা প্রদর্শন কর তার উপরে তোমার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও। কেউ ক্ষমায় পৌঁছানোর পথ পায় না শুধু সে ছাড়া যাকে আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ক্ষমা ও মার্জনা করে দিয়েছেন সে যে গুনাহ করেছে তা থেকে এবং যে কাজ সে ফেলে রেখেছিলো তার জন্য এবং যাকে তাঁর সম্মানের পদক দিয়ে সাজানো হয়েছে এবং তাঁর জ্যোতির নূরের পোষাক পরানো হয়েছে।

এটি এজন্য যে ক্ষমা ও মার্জনা আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দু'টো গুণাবলী যা তিনি আমানত রেখেছেন তাঁর বিশুদ্ধ বন্ধুদের ভেতরে যেন তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা ও নির্মাতা সৃষ্টির সাথে যেমন আচরণ করেন সেরূপ আচরণ অবলম্বন করে। এজন্য তিনি বলেছেনঃ

(وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)

''তাদের উচিত ক্ষমা করা ও উপেক্ষা করা। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সূরা নূরঃ ২২)

যদি তুমি তোমার মত একজন মরণশীলকে ক্ষমা না কর তাহলে তুমি কীভাবে সর্ববাধ্যকারী বাদশাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা আশা কর?

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে, তার রব তাকে আদেশ করেছেন এ গুণগুলো ধারণ করতে এই বলেঃ ''তার সাথে একতাবদ্ধ হও যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং তাকে ক্ষমা করো যে তোমার প্রতি অন্যায় করে; তাকে দান কর যে তোমাকে বঞ্চিত করে এবং তার প্রতি ভালো

ব্যবহার করো যে তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে।'' তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন তাকে অনুসরণ করার জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)

''রাসূল তোমাদের যা দেয়, তা গ্রহণ করো এবং যা তিনি তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে সরে থাকো।'' (সূরা হাশরঃ ৭)

ক্ষমা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার একটি গোপন রহস্য যা তাঁর বাছাইকৃত ব্যক্তিদের অন্তরে আছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ''তোমাদের মধ্যে কেউ কি আবু দামদাম- এর মত ক্ষমতা রাখো?''- তারা বললোঃ ''হে আল্লাহর রাসূল- আবু দামদাম কে?'' রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ ''তোমাদের একজন পূর্বপুরুষ যে সকালে ঘুম থেকে জেগে বলতোঃ হে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা, সাধারণ জনগণ কর্তৃক আমার সম্মানহানি করাকে আমি ক্ষমা করে দিয়েছি।''

সতর্ক করা

সর্তক করার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হলো যখন কথা সত্যের সীমানা অতিক্রম না করে এবং কাজসমূহ আন্তরিকতার সীমানা অতিক্রম না করে। সতর্ককারী ও যাকে সতর্ক করা হচ্ছে তারা একজন জাগ্রত ও অন্যজন ঘুমন্ত ব্যক্তির মত। যে ব্যক্তি তার কথা অগ্রাহ্য করা, বিরোধিতা ও বিদ্রোহের ঘুম থেকে জেগে উঠে অন্যদের সেই ঘুম থেকে জাগায় সে ভালো কাজ করে।

যে ব্যক্তি সীমালংঘনের মরুভূমিতে ভ্রমণ করে এবং নিজেকে নিমজ্জিত করে বিভ্রান্তির বন্যতায়, তার মার্জিত স্বভাব ত্যাগ করে সুনাম, লোক দেখানো ও বিখ্যাত হওয়ার ভালোবাসায়, যারা সৎকর্মশীলতার পোষাক পরেছে তাদের সময় নষ্ট করে এবং তার বাইরের চেহারা প্রকৃত অবস্থাকে লুকিয়ে রেখেছে- যা তার ভেতরে আছে। বাস্তবে সে ভেতরে শূন্য এবং তার ভেতরের দেউলিয়াত্ব ডুবে গেছে প্রশংসার ভালোবাসায় এবং ঢেকে গেছে লোভের অন্ধকারে । কতই না প্রতারিত সে তার কামনা বাসনার মাধ্যমে। কীভাবেই না সে জনগণকে পথভ্রষ্ট করে তার কথায়! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ)

‘‘নিশ্চয়ই খুব খারাপ এই অভিভাবক এবং নিশ্চয়ই খুব খারাপ এই সাথী।’’ (২২:১৩)

কিন্তু যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা রক্ষা করেছেন তাওহীদের আলো, সমর্থন এবং সুন্দর সফলতা দিয়ে, তার অন্তরকে অপবিত্রতা থেকে পরিষ্কার করা হয়েছে। সে নিজেকে ইরফান (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) থেকে এবং সতর্কতা অবলম্বন থেকে বিচ্ছিন্ন করে না; সে পথভ্রষ্ট লোকের কথাগুলো শোনে অথচ বক্তাকে উপেক্ষা করে – সে যেই হোক। প্রজ্ঞাবানরা বলেছেনঃ ‘প্রজ্ঞা গ্রহণ করো যদি তা কোন পাগলের মুখ থেকেও আসে।’ ঈসার (আ.) কথা অনুযায়ীঃ ‘‘তার সাথে বসো যে তোমাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যখন তুমি তাকে দেখতে পাও ও তার সাক্ষাতে যাও, সে যখন কথা বলে তখন তা সংরক্ষণ কর। সে ব্যক্তির সাথে বসো না যাকে তোমার বাইরের সত্তা গ্রহণ করে কিন্তু ভিতরের সত্তা তাকে

প্রত্যাখ্যান করে।' সে ঐ ব্যক্তি যে তার দাবী করে যা তার ভেতরে নেই; যদি তুমি আন্তরিক হও তাহলে তারা তোমার দিকে ঝুঁকবে। যখন তুমি কাউকে এ তিনটি গুণসম্পন্ন দেখবে, তাহলে তাকে দেখার ও তার সাথে সাক্ষাত করার সুযোগ গ্রহণ করো এবং তাদের সাথে বসো, যদি তা শুধু এক ঘন্টার জন্যও হয়। এর একটি প্রভাব পড়বে তোমার বিশ্বাস, তোমার অন্তর এবং তোমার ইবাদাতের উপর – তার বরকতে।

যদি কোন ব্যক্তির কথা তার কাজকর্মকে অতিক্রম করে না, যার কাজকর্ম তার সত্যবাদিতাকে অতিক্রম করে না এবং যার সত্যবাদিতা তার রবের সাথে তর্ক করে না, তাহলে তার সাথে শ্রদ্ধার সাথে বসো এবং রহমত ও বরকতের জন্য অপেক্ষা করো। তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণের বিষয়ে সাবধান হও এবং তোমার সাথে তার সময়কে প্রীতিকর কর, যাতে তুমি তাকে তিরস্কার না কর এবং ক্ষতিগ্রস্থ না হও। তার প্রতি তাকাও তার উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নেয়ামত ও তাকে তাঁর নির্বাচন করা এবং তাকে তাঁর মর্যাদা দেয়ার দৃষ্টি দিয়ে।

পরামর্শ

সবচেয়ে ভালো পরামর্শ ও সবচেয়ে যা জরুরী তাহলো তুমি যেন তোমার রবকে ভুলে না যাও এবং যেন তুমি তাঁকে সবসময় স্মরণ রাখো এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না কর এবং যেন তুমি তাঁর ইবাদাত কর- হোক দাঁড়িয়ে অথবা বসে। তাঁর নেয়ামত দেখে অন্ধ হয়ে যেও না এবং তার প্রতি সবসময় কৃতজ্ঞ থাকো। তাঁর করুণা, বিশালতা ও নিরাপদ ছাতার নীচ থেকে বেরিয়ে যেও না- এতে হয়তো তুমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে এবং ধ্বংসের মাঝে পড়ে যাবে, যদি এমনও হয় যে দুঃখ-কষ্ট ও দুর্দশা তোমাকে স্পর্শ করেছে এবং পরীক্ষার আগুন তোমাকে পুড়ছে। জেনে রাখো, যে দুঃখ- দুর্দশা তিনি পাঠান তা তাঁর চিরস্থায়ী সম্মানের পদক দিয়ে পূর্ণ এবং যে পরীক্ষায় তিনি ফেলেন তা তাঁর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য আনে। এমনও যদি হয় তা কিছু সময় পরে আসে। কী নেয়ামতই না আছে সে ব্যক্তির জন্য যার জ্ঞান আছে এবং যাকে সেখানে সফলতা দান করা হয়েছে।

বর্ণিত আছে যে কেউ একজন রাসূলুল্লাহর (সা.) পরামর্শ চাইলো, তিনি বললেনঃ ‘‘কখনো রাগ হয়ো না, কারণ রাগের ভেতর আছে তোমার রবের বিরোধিতা। ওযর দেখানোতে সাবধান থাকো, কারণ এর ভেতর আছে লুকানো শিরক। নামায পড়ো তার মত যে চিরবিদায় নিচ্ছে, কারণ এর ভেতর আছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে যোগাযোগ এবং তাঁর নৈকট্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সামনে বিনম্র হও যেভাবে তুমি তোমার সৎকর্মশীল প্রতিবেশীদের সামনে বিনম্র হও, কারণ এর ভেতর আছে ইয়াক্বীন- এ বৃদ্ধি।’’

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের [নবী পরিবার (আ.)] দূরবর্তী ও নিকটবর্তী সব পূর্বপুরুষদের উপদেশগুলোকে একক বৈশিষ্ট্যে একত্র করেছেন।

সতর্কতা (**তাক্বওয়া**)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভাষায়ঃ

(وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ)

‘‘নিশ্চয়ই আমরা তাদের আদেশ দিয়েছি – যাদেরকে তোমাদের আগে কিতাব দেয়া হয়েছিলো এবং তোমাদেরও যে, তোমাদের উচিত আল্লাহর প্রতি (তোমাদের দায়িত্বে) সতর্ক হওয়া ।’’ (সূরা নিসাঃ ১৩১)

প্রত্যেক নির্ভুল ইবাদাতের সারাংশ হচ্ছে এটি : তাক্বওয়ার মাধ্যমেই মানুষ উচ্চ স্থান ও সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করে। তাক্বওয়ার মাধ্যমেই মানুষ একটি ভালো জীবন যাপন করে যেখানে আছে সার্বক্ষণিক সাহচর্য।

(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ)

‘‘নিশ্চয়ই যারা পাহারা দেয় (অন্যায়ের বিরুদ্ধে) তারা থাকবে বাগানগুলোতে এবং নদীগুলোতে- সম্মানের আসনে সবচেয়ে শক্তিশালী বাদশাহর সাথে।’’ (সূরা কামারঃ ৫৪- ৫৫)

পূর্ণ আস্থা রাখা (**তাওয়াক্কুল**)

তাওয়াক্কুল একটি পেয়ালা যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে মুখ সীল করা অবস্থায় আছেঃ কেউ এ থেকে পান করতে পারবে না এবং এর সীল ভাঙ্গতে পারবে না আস্থাশীলরা ছাড়া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ)

''আল্লাহর উপরেই শুধু আস্থাশীলরা নির্ভর করুক।'' (সূরা ইবরাহীমঃ ১২)

(وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)

''আল্লাহর উপরেই তোমাদের নির্ভর করা উচিত যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাকো।'' (সূরা মায়িদাঃ ২৩)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাওয়াক্কুলকে বিশ্বাসের চাবি বানিয়েছেন এবং বিশ্বাসকে তাওয়াক্কুলের তালা বানিয়েছেন। তাওয়াক্কুলের বাস্তবতা (হাক্বীক্বাত) হলো নিজের উপরে অন্যদের অগ্রাধিকার দেয়া। অন্যদের অগ্রাধিকার দেয়ার মূল হচ্ছে অন্য ব্যক্তির দাবীকে এগিয়ে দেয়া। যে আস্থা রাখে সে তার আস্থাতে দু'টো অগ্রাধিকারের একটিকে ক্রমাগতভাবে সত্যায়ন করে যায়। যদি সে সৃষ্টিকে অগ্রাধিকার দেয় তাহলে এটি হয়ে যায় একটি পর্দা যাতে সে ঢেকে যায়। যদি সে আস্থার কারণের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে অগ্রাধিকার দেয় তাহলে সে তাঁর সাথে থাকে। যদি তুমি তাওয়াক্কুলের মানুষ হতে চাও এবং সৃষ্টির মানুষ হতে না চাও তাহলে তোমার রুহের উপর পাঁচ বার তাকবীর বলো এবং তোমার সব আশাকে বিদায় জানাও যেভাবে মৃত্যু বিদায় জানায় জীবনকে।

সবচেয়ে নিচের স্তরের তাওয়াক্কুল হলো তোমার অগ্রযাত্রার সামনে তোমার সর্বোচ্চ আশাকে স্থান দেয়া, এ ছাড়া আর কিছু নয়। তোমার না উচিত তোমার অংশ চাওয়া, না দেখার চেষ্টা করা তোমার কীসের অভাব আছে, কারণ এ দু'টোর যে কোন একটি তোমার ঈমানের বন্ধনকে ছিঁড়ে ফেলবে আর তুমি তা বুঝতেও পারবে না। যদি তুমি সত্যিকারভাবেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকো যে তাওয়াক্কুলকারীদের একটি পদক নিয়ে বেঁচে থাকবে এ দু'টো অগ্রাধিকারের যে কোন একটি বিষয়ে তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করার মাধ্যমে তাহলে এ ঘটনাটি দৃঢ়ভাবে ধরে রাখো। বর্ণিত আছে

তাওয়াক্কুল সম্পন্ন এক ব্যক্তি ইমামদের (আ.) একজনের কাছে এলো এবং তাকে বললোঃ ‘‘তাওয়াক্কুলের বিষয়ে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমার প্রতি দয়া করুন ।’’

ইমাম জানতেন যে ঐ ব্যক্তির ছিলো প্রশংসনীয় তাওয়াক্কুল ও অসাধারণ (তাকওয়া) সতর্কতা এবং তিনি ঐ ব্যক্তি প্রশ্ন করার আগেই দেখতে পেয়েছিলেন যে, সে যে প্রশ্ন করছিলো তার বিষয়ে সে আন্তরিক। তিনি বললেন, ‘‘তুমি যেখানে আছো সেখানেই থাকো এবং আমার সাথে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো।’’ যখন তিনি তার উত্তর সাজাচ্ছিলেন একজন দরিদ্র লোক পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। ইমাম তার পকেটে হাত দিলেন এবং কিছু বের করলেন এবং দরিদ্র লোকটিকে তা দিলেন। এরপর তিনি প্রশ্নকারীর দিকে ফিরে বললেনঃ ‘‘আসো এবং জিজ্ঞেস করো সে সম্পর্কে যা তুমি দেখেছো।’’ লোকটি বললোঃ ‘হে ইমাম, আমি জানি যে আপনি আমাকে প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারতেন আমাকে অপেক্ষা করানোর আগেই। তাহলে কেন আপনি দেরী করলেন?’ এবার ইমাম বললেনঃ ‘‘বিশ্বাস হচ্ছে আমি বলার আগেই অর্থের উপর চিন্তা করা। কারণ কীভাবে আমি আমার গভীরতম সত্তার বিষয়ে অবহেলা করতে পারি যখন আমার রব তা দেখতে পান? আমি কীভাবে তাওয়াক্কুলের বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করতে পারি যখন আমার পকেটে একটি মুদ্রা রয়েছে? আমার জন্য অনুমতি নেই যে তাওয়াক্কুলের বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করবো যতক্ষণ না আমি তাকে তা (মুদ্রাটি) না দিয়েছি। অতএব বুঝে নাও!’ প্রশ্নকারী গভীর নিশ্বাস ফেললো এবং শপথ করলো যে যতদিন সে বেঁচে আছে সে কোন বাড়িতে আশ্রয় খুঁজবে না, না মরণশীল কারো উপর নির্ভর করবে ।

পরিচ্ছেদ- ২১

ভাইদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

বিশ্বাসে যারা ভাই তারা করমর্দন করে তাদের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভালোবাসার কারণে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ''যখনই ভাইরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পথে করমর্দন করে তাদের ভুল কাজগুলো দূর হয়ে যায় এবং এতে তারা সেদিনের মত হয়ে যায় যে দিন তাদের মা তাদেরকে জন্ম দিয়েছিলো।'' যখন দুই ভাইয়ের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায় তখন তাদের জন্যও তার বৃদ্ধি ঘটে। দুজনের মধ্যে যার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ধর্ম সম্পর্কে বেশী জ্ঞান আছে তার জন্য বাধ্যতামূলক যে সে তার বন্ধুকে উৎসাহিত করবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যে বাধ্যতামূলক কাজগুলোকে প্রয়োজনীয় করেছেন তা সম্পাদন করতে এবং তাকে পথ দেখাবে সোজা পথে যাওয়ার জন্য, সন্তুষ্টি ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে, তাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার রহমতের সুসংবাদ দিবে এবং তাঁর শাস্তির ভয় দেখাবে। অন্য ভাইটি তার পথ দেখানোর রহমতকে চাইবে এবং তা সে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে যার দিকে সে ডাকছে, তার সতর্কবাণী মনে রাখবে এবং তার মাধ্যমে পথ দেখবে এবং এই পুরো সময়ে সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে নিরাপত্তা চাইবে এবং তাঁর সাহায্য ও সফলতা চাইবে।

ঈসা (আ.)- কে একবার জিজ্ঞেস করা হলোঃ ''আজ সকালে আপনি কেমন আছেন?'' তিনি বললেনঃ 'আমি যা আশা করি তার কল্যাণ আমার আয়ত্তে নেই, না আমি প্রতিরোধ করতে পারি তাকে যার বিরুদ্ধে আমি সতর্ক পাহারায় আছি। একই সময়ে আমাকে আদেশ করা হয়েছে অনুগত হয়ে চলতে এবং নিষেধ করা হয়েছে বিদ্রোহ করতে। আমি মনে করি না আমার চাইতে বেশী ফকির কোন ফকির আছে।' উয়ায়েস আল- ক্বারানিকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা

হয়েছিলো, সে বলেছিলোঃ ‘‘ঐ লোক সকালে কেমন থাকবে যখন সে জানে না সে সন্ধ্যায় বেঁচে থাকবে কিনা এবং সন্ধ্যায় সে জানে না সকাল পর্যন্ত সে বেঁচে থাকবে কিনা?’’

আবু যার বলেছিলোঃ ‘‘সকালে আমি ধন্যবাদ দেই আমার রবকে এবং ধন্যবাদ দেই আমাকে।’

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ‘‘যে সকালে ঘুম থেকে ওঠে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে ছাড়া অন্য কিছুর আশা করে সে ক্ষতিগ্রস্থ ও সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।’

সংগ্রাম ও শৃঙ্খলা

প্রশান্তি সেই বান্দাহর অধিকারে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য সংগ্রাম করে তার নিজের প্রকৃতি ও কামনা- বাসনার বিরুদ্ধে : যে তার কামনা- বাসনাকে পরাজিত করে সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টি জিতে নেয় এবং আল্লাহর দাসত্বে যার বুদ্ধি তার নিজের সত্তাকে পিছনে ফেলে দেয় চেষ্টা, সংগ্রাম, আত্মসমর্পণ এবং বিনয়ের মাধ্যমে সে এক বিরাট বিজয় অর্জন করেছে। বান্দাহ ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার মাঝে নফস ও কামনা- বাসনার চেয়ে বেশী অন্ধকার অথবা এর চেয়ে বেশী নির্জন কোন পর্দা নেই। এগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পূর্ণ প্রয়োজন অনুভব করা, ভয়, ক্ষুধা, দিনের বেলা পিপাসা এবং রাতের বেলায় জেগে থাকার চাইতে ভালো আর কোন অস্ত্র নেই।

যখন এ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কোন ব্যক্তি মারা যায় সে মৃত্যুবরণ করে শহীদের মর্যাদা নিয়ে। যদি সে সোজা পথ অনুযায়ী চলে তাহলে তার শেষ তাকে নিয়ে যাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সর্বোচ্চ সন্তুষ্টির কাছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ)

''আর যারা আমাদের জন্য কঠিন সংগ্রাম করে, আমরা অতি অবশ্যই তাদেরকে পথ দেখাবো আমাদের পথে এবং অতি অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।'' (সূরা আনকাবুতঃ ৬৯)

যখন তুমি দেখ অন্য কেউ তোমার চেয়ে বেশী চেষ্টা করছে তখন নিজেকে তিরস্কার করো ও বকা দাও নিজেকে উৎসাহিত করার জন্য- আরো বেশী চেষ্টা করতে।

আদেশ ও নিষেধের লাগাম পরাও নিজের সত্তাকে এবং এমনভাবে কাজ চালিয়ে যাও যেন তুমি একজন প্রশিক্ষক যে তার ঘোড়াকে একটি পদক্ষেপও নিতে দেয় না যদি তা পুরোপুরি সঠিক না হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এত লম্বা সময় ধরে নামায পড়তেন যে তার পা দু'টো ফুলে যেতো। তিনি বলতেনঃ 'আমি কীভাবে একজন কৃতজ্ঞ বান্দাহ না হই?' রাসূলুল্লাহ (সা.) চেয়েছিলেন যেন তার সম্প্রদায় তা বিবেচনা করে। যাতে তারা সংগ্রাম, পরিশ্রম ও শৃঙ্খলাকে কোন অবস্থাতেই উপেক্ষা না করে। যদি তোমার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ইবাদাতের মিষ্টি স্বাদ পাওয়ার অভিজ্ঞতা হতো, বরকত দেখতে পেতে এবং এর আলোতে আলোকিত হতে তাহলে তুমি এর অনুপস্থিতিতে এক ঘন্টার জন্যও ধৈর্য ধরতে না, এমনকি তোমাকে কেটে টুকরো করে ফেললেও না। কেউ এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় না যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছ থেকে এরকম নিরাপত্তা ও সফলতা থেকে কাউকে প্রত্যাখ্যান করা না হয় যা অর্জন করেছিলো তার পূর্বপুরুষেরা।

রাবি ইবনে কুসাইমকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো কেন সে রাতে ঘুমাতো না। সে উত্তর দিয়েছিলোঃ ''কারণ আমি ভয় পাই যে রাতটি হয়তো আমি ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিবো।''

মৃত্যু নিয়ে ভাবা

মৃত্যুকে নিয়ে ভাবলে তা আশা আকাঙ্ক্ষাকে হত্যা করে, কথা গ্রাহ্য না করার শিকড়কে কেটে ফেলে এবং অন্তর শক্তিশালী হয় আখেরাতের জীবন সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতিশ্রুতিতে।

এটি প্রকৃতিকে পরিশুদ্ধ করে এবং কামনা- বাসনার চিহ্নগুলো ভেঙ্গে ফেলে, লোভের আগুনকে নিভিয়ে ফেলে এবং পৃথিবীকে ঘৃণ্য বানিয়ে দেয়; এটিই হলো রাসূলুল্লাহর (সা.) কথার অর্থঃ ''এক ঘন্টার জন্য ভাবা এক বছরের ইবাদাতের চেয়ে উত্তম।'' ঐ এক ঘন্টার ভাবনা হলো সেই মুহূর্ত যখন তুমি এ পৃথিবীর সাথে তোমাকে বেঁধে রাখা রশিগুলো খুলে ফেলবে এবং সেগুলোকে আখেরাতের সাথে বেঁধে নিবে। যখন মৃত্যুকে এভাবে স্মরণ করা হয়, আকাশ থেকে রহমত বর্ষণ কখনোও বন্ধ হয় না। যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যুর বিষয় এবং এ থেকে তার নিজের পালানোর উপায়ের অভাবের বিষয়, তার বিরাট অক্ষমতার বিষয়, কবরে কত লম্বা সময় ধরে সে থাকবে এবং কেয়ামতের সময় তার কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার বিষয় না ভাবে তাহলে তার ভেতরে ভালো কিছু নেই।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ''আনন্দ ফুর্তির ধ্বংসকারীকে স্মরণ রেখো।'' যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো সেটি কী, তিনি বললেনঃ ''মৃত্যু। যখনই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কোন বান্দাহ তা করে যখন সে ধনী তখন এ পৃথিবী তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়। যখন সে একে স্মরণ করে কষ্টের সময় তখন তা তার জন্য প্রশস্ত হয়ে যায়।'' মৃত্যু হলো পরবর্তী পৃথিবীর প্রথম ষ্টেশন এবং এ পৃথিবীর শেষ ষ্টেশন। রহমতপ্রাপ্ত সে যে নিজের প্রতি উদারতা দেখায় এবং উপকার লাভ করে শুরুতে এবং রহমতপ্রাপ্ত সে যে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে শেষে।

আদম সন্তানের সবচেয়ে নিকট সাথী হলো মৃত্যু। যদিও সে স্বপ্ন দেখে যে তা সবচেয়ে দূরে। মানুষ নিজেকে কতই না আঘাত করে। এর চেয়ে দূর্বল আর কোন প্রাণী আছে? মৃত্যুতেই নিহিত আছে মুখলেস (আন্তরিক) লোকদের উদ্ধার এবং অন্যায়কারীদের ধ্বংস।

এজন্যই কিছু মানুষ মৃত্যুকে চায় যখন অন্যরা একে ঘৃণা করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ‘‘যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে সাক্ষাত করে তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার সাথে সাক্ষাত করতে ভালোবাসেন এবং যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে সাক্ষাত করাকে ঘৃণা করে তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার সাথে সাক্ষাত করাকে ঘৃণা করেন।’’

ভালো ধারণা

ভালো ধারণার শিকড় হলো ব্যক্তির বিশ্বাস ও তার অন্তরের সুস্থতা; ভালো ধারণার চিহ্ন হলো যখনই সে তাকায় সে পবিত্রতা ও ধার্মিকতার দৃষ্টি দিয়ে দেখে যেখানেই সে যায় এবং মধ্যপন্থা, বিশ্বস্ততা, নিরাপত্তা ও সত্যবাদিতা তার অন্তরে স্থাপন করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ''তোমার ভাইদের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখো। এর মাধ্যমে তুমি অন্তরের পবিত্রতা ও প্রকৃতিতে দৃঢ়তা লাভ করবে।'' উবাই ইবনে কা'ব বলেছিলোঃ 'যখন তুমি তোমার ভাইদের ভেতর কোন গুণকে পছন্দ না কর তাহলে এর সত্তরটি ব্যাখ্যা দাও এবং দেখো যে এর কোন একটির সাথে তোমার অন্তর শান্তি পায় কিনা। যদি তা না হয় তাহলে নিজেকে দোষারোপ করো যদি তাকে মার্জনা করতে না পারো। যদি তোমার কোন গুণ থাকে যার সত্তরটি ব্যাখ্যা আছে তাহলে তোমার উচিত তাকে অপছন্দ করার চাইতে তোমার নিজেকে আরও বেশী অপছন্দ করা।' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা দাউদ (আ.)- কে বলেছিলেনঃ 'আমার বান্দাহদের স্মরণ করিয়ে দাও আমার রহমত ও নেয়ামতগুলো সম্পর্কে। তারা শুধু বিশেষ ভালো জিনিসগুলোই আমার কাছ থেকে দেখতে পেয়েছে তাই তাদের উচিত শুধু তাই আশা করা যে, যা বাকী রয়ে গেছে তা ইতোমধ্যেই তারা যা পেয়েছে তারই মত হবে।'' ভালো ধারণা ভালো ইবাদাত এনে দেয়। যে ব্যক্তি ধোঁকায় পড়েছে সে বিদ্রোহের ভিতর পড়ে থাকে যদিও সে ক্ষমার আশা করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সৃষ্টির প্রতি ভালো ধারণা রাখা তাদের জন্য বিশেষভাবে রাখা হয়েছে যারা তাঁকে মানে, তাঁর পুরস্কার আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় পায়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) তার রবের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেনঃ ''আমি আছি আমার বান্দাহদের ভালো ধারণার সাথে, হে মুহাম্মাদ, যে তার রবের সম্পর্কে ভালো ধারণার নেয়ামতগুলোর বাস্তবতা মেনে চলতে ব্যর্থ হয় সে তার নিজের বিরুদ্ধে প্রমাণ জোরদার করেছে এবং সে তাদের একজন যারা তাদের কামনা- বাসনার শিকলে প্রতারিত হয়েছে।''

পরিচ্ছেদ- ২২

নিজেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে সমর্পন করা

যে তার নিজের বিষয়কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে সমর্পণ করে সে চিরস্থায়ী আরাম ও সার্বক্ষণিক চিন্তামুক্ত জীবন যাপন করে। একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ছাড়া সে কোন কিছু নিয়ে চিন্তা করার উর্ধ্বে। আমিরুল মুমিনীন যেরকম বলেছেন : ''আমি সন্তুষ্ট ছিলাম যা আল্লাহ আমার জন্য নির্ধারণ করেছেন এবং আমি আমার বিষয়কে আমার সৃষ্টিকর্তার কাছে সমর্পণ করেছি।''

চলে যাওয়া বিষয়গুলোতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যে রকম ভালো ছিলেন (মানুষের প্রতি), সেরকমই তিনি থেকে যাওয়া বিষয়গুলোতেও (মানুষের প্রতি) ভালো থাকবেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ একজন বিশ্বাসীর ভাষায় যে ছিলো ফেরাউনের লোকজনের ভেতরেঃ

(وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ)

''আমি আমার বিষয়কে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার বান্দাহদের দেখেন। তাই আল্লাহ তাকে রক্ষা করলেন তাদের পরিকল্পনার অনিষ্ট থেকে এবং সবচেয়ে খারাপ শাস্তি ফেরাউনের দলকে স্পর্শ করলো।'' (সূরা মুমিনঃ ৪৪- ৪৫)

تفويد (তাফউইদ বা সমর্পণ করা) শব্দটিতে পাঁচটি অক্ষর আছে, প্রত্যেকটি অক্ষরে একটি আদেশ রয়েছে। যে এ আদেশগুলো গ্রাহ্য করে সে এগুলো মেনে চলে- যেমন ترک (তারক বা পরিত্যাগ করা) এর 'ت' যার অর্থ হলো এ পৃথিবীতে পরিকল্পনাগুলো ত্যাগ করা; فنا (ফানা বা বিলীন হওয়া)- এর 'ف' যার অর্থ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ছাড়া সবকিছুর আশা বিলীন হওয়া; وفا (ওয়াফা বা চুক্তি)- এর 'و' যা হলো চুক্তি বাস্তবায়ন করা এবং প্রতিশ্রুতির পূরণ

করা; يأس (ইয়া'স বা হতাশ হওয়া)- এর 'ى' যা হলো নিজেকে নিয়ে হতাশ হওয়া এবং তোমার রবের বিষয়ে يقين ইয়াক্বীন এবং ضمير (দামির বা বিবেক)- এর 'ض', যা হলো একমাত্র আল্লাহর জন্য বিবেক এবং ضرورة (দারুরাহ বা প্রয়োজন) তাঁকে (আল্লাহকে) প্রয়োজন। যে তার সবকিছু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে সমর্পণ করে সে সকালে ঘুম থেকে উঠে সব খারাপ মুক্ত হয়ে এবং রাতে সে বিশ্বাসের পূর্ণ নিরাপত্তা নিয়ে ঘুমায়।

ইয়াক্বীন (যে বিশ্বাস নিশ্চয়তায় পৌঁছেছে)

ইয়াক্বীন বান্দাহকে নিয়ে যাবে প্রত্যেক ঐশী অবস্থায় (হাল) এবং বিস্ময়কর মাক্বামে; ঈসার (আ.) ইয়াক্বীন- এর বিশালতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) জানালেন যে তিনি পানির উপর হাঁটতেন। তিনি বলেছেনঃ ''যদি তার আরও ইয়াক্বীন থাকতো তাহলে সে বাতাসে হাঁটতো।' এর মাধ্যমে তিনি ঈঙ্গিত করেছেন যে আল্লাহর কাছে রাসূলদের (আ.) বিরাট মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও তাদের ইয়াক্বীন অনুযায়ী তাদের মর্যাদার শ্রেণী বিভাগ ছিলো। ইয়াক্বীন সব সময় বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং চিরকাল ধরে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশ্বাসীদের মাঝেও পার্থক্য আছে তাদের ইয়াক্বীনের শক্তি ও দূর্বলতা অনুযায়ী। যার ইয়াক্বীন শক্তিশালী তাকে চেনা যায় এ বাস্তবতার মাধ্যমে যে – সে দেখে কোন শক্তি ও কোন ক্ষমতা নেই যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে দিয়েছেন তা ছাড়া এবং তার প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আদেশ মেনে চলা ও ইবাদাত করা দেখে। থাকা ও না থাকা, বৃদ্ধি পাওয়া ও কমে যাওয়া, প্রশংসা ও দোষারোপ, শক্তি ও মর্যাদাহীনতাকে সে একই স্তরে বলে মনে করে। যে ব্যক্তি তার ইয়াক্বীনকে দূর্বল করে সে নিজের নফসকে লাগামহীন রাজত্ব করতে দেয়। সে সাধারণ জনগণের রীতিনীতি ও কথাকে অনুসরণ করে সেগুলোর কোন প্রমাণ না দিয়ে এবং এ পৃথিবীর বিষয়গুলোর জন্য সংগ্রাম করে, এর সম্পদ জমা করে এবং তা আঁকড়ে ধরে রাখে – তার জিহবার মাধ্যমে তা স্বীকার করে ও সত্যায়ন করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ছাড়া বঞ্চিত রাখারও কেউ নেই দেয়ারও কেউ নেই এবং বান্দাহ শুধু তাই নিতে পারে যা তাকে দেয়া হয় এবং যা তার জন্য নির্ধারিত হয়। চেষ্টা রিযক বৃদ্ধি করে না। কিন্তু সে তা অস্বীকার করে তার কাজ ও অন্তর দিয়ে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কথায়ঃ

(يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ)

''তারা তাদের মুখ দিয়ে বলে যা তাদের অন্তরে নেই এবং আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন তারা কী লুকায়।'' (সূরা আলে ইমরানঃ ১৬৭)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর বান্দাহদের প্রতি দয়ালু ছিলেন যখন তিনি তাদেরকে অর্থ উপার্জনের অনুমতি দিয়েছিলেন যেভাবে তারা চায়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দেয়া সীমানা অতিক্রম না করে অথবা তাঁর প্রতি দায়িত্ব ও তাঁর রাসূলের (সা.) সুন্নাত পরিত্যাগ না করে এবং লোভের ময়দানে বন্দী না হয়ে পড়ে। কিন্তু যখন তারা তা ভুলে যায় ও নিজেদেরকে সেসবের সাথে যুক্ত করে যা তাদের বলা হয়েছে তার বিপরীত, তখন তাদেরকে ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে গোনা হবে; শেষ পর্যন্ত মিথ্যা দাবী ছাড়া যাদের কিছু থাকে না। যারা উপার্জন করে তাদের সবাই যথেষ্ট বিশ্বস্ত নয়ঃ সে শুধু নিষিদ্ধ ও সন্দেহযুক্ত জিনিস আনে উপার্জন হিসাবে। তাকে চেনা যাবে তার উপরে তার উপার্জনের প্রভাব ও তার সীমাহীন ক্ষুধা এবং কোন বিরতি ছাড়া পৃথিবীর জন্য সে কীভাবে খরচ করে তা দেখে।

ভয় ও আশা

ভয় হচ্ছে অন্তরের হেফাযতকারী এবং আশা হচ্ছে সত্তার শাফায়াতকারী। যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে চেনে সে তাঁকে ভয় করে এবং তাঁর প্রতি আশা স্থাপন করে। এগুলো হচ্ছে বিশ্বাসের দু'টো পাখা যা দিয়ে প্রকৃত বান্দাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টির দিকে উড়ে যায়। এগুলো বুদ্ধির দু'টো চোখ যাদের মাধ্যমে সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতিশ্রুতি ও হুমকি দেখতে পায়; তার ভয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ন্যায় বিচার সম্পর্কে ভাবে সেই হুমকিকে খুব সতর্কতার সাথে বিবেচনা করার মাধ্যমে। আশা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপচে পড়া নেয়ামত ডেকে আনে এবং অন্তরকে জীবন দেয়, একই সময়ে ভয় নফসকে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

''বিশ্বাসীর আছে দু' ধরনের ভয় : যা চলে গেছে তা নিয়ে ভয় এবং যা আসবে তার জন্য ভয়।''

নফস- এর মৃত্যুতে নিহিত আছে অন্তরের জন্য জীবন – যা আমলে দৃঢ়তা আনে। যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ইবাদাত করে ভয় ও আশার ভারসাম্য নিয়ে সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং সে যা আশা করে তা লাভ করবে। একজন বান্দাহ ভীত ছাড়া আর কী হবে যখন সে জানে না তার কোন কাজের সময় তার খাতা বন্ধ হবে, যখন তার কাছে কৃত এমন কোন আমল নেই যা তাকে সাহায্য করতে পারে, কোন শক্তি নেই কিছু করার এবং কোন জায়গা নেই পালাবার? কীভাবে সে আশা করতে ব্যর্থ হবে যখন সে জানে তার অক্ষমতা সত্ত্বেও সে ডুবে আছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার রহমত ও নেয়ামতগুলোর ভেতর যা গোনা যায় না বা যেগুলোকে সংখ্যাবদ্ধ করা যায় না। প্রেমিক তার রবের ইবাদাত করে আশা নিয়ে, নিজের অবস্থা নিয়ে ভাবে জাগ্রত ব্যক্তির দৃষ্টি দিয়ে এবং যাহেদ (যে বিরত থাকে) ইবাদাত করে ভয় নিয়ে।

হারাম ইবনে হাইয়্যানকে উয়ায়েস আল- ক্বরনী বলেছিলো : ''মানুষ আশার কারণে কাজ করে, কিন্তু তুমি কাজ কর ভয়ে।'' হারাম বললোঃ ''দু ধরনের ভয় আছে : স্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল। স্থায়ী ভয় আশা আনে, আর পরিবর্তনশীল ভয় আনে স্থায়ী ভয়। একইভাবে দু'ধরনের আশা

আছে : গোপন ও প্রকাশ্য। গোপন আশা স্থায়ী ভয় আনে যা প্রেমের যোগসূত্রকে শক্তিশালী করে; আর প্রকাশ্য আশা তার জীবৎকালে সে যা করেছে সে বিষয়ে তার অক্ষমতা ও ত্রুটিগুলো সম্পর্কে প্রত্যাশাগুলো পূর্ণ করে।

তৃপ্তি

তৃপ্তি হলো যখন কোন ব্যক্তি সে যা ভালোবাসে ও সে যা ঘৃণা করে তা নিয়ে সন্তুষ্ট আছে; এটি মারেফাতের নূরের একটি রশ্মি। যে তৃপ্ত সে তার সমস্ত পছন্দে বিলীন হয়ে গেছে; সে হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সন্তুষ্ট আছেন। তৃপ্ত একটি নাম যা দাসত্বের অর্থ করে এবং একে অন্তরের আনন্দ হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে।

আমি আমার পিতা মুহাম্মাদ আল বাক্বির- কে বলতে শুনেছিঃ ''যা উপস্থিত আছে তার সাথে অন্তরকে যুক্ত করা হলো শিরক এবং যা নেই তার সাথে যুক্ত করা কুফর (অবিশ্বাস): কথা গ্রাহ্য না করার স্বভাবের পাখা হলো এ দু'টি। আমি অবাক হই তাকে নিয়ে যে দাবী করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দাস হিসাবে এবং এরপর তাঁর রায়গুলো নিয়ে তর্ক করে। তৃপ্ত আধ্যাত্মিক লোকেরা (আরিফীন) এ রকম হওয়া থেকে অনেক দূরে।''

পরিচ্ছেদ- ২৩

দুঃখ- কষ্ট

দুঃখ- কষ্ট হচ্ছে বিশ্বাসীর অলংকার এবং বুদ্ধিমান লোকদের জন্য সম্মানের পদক, কারণ সরাসরি এর মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন দৃঢ়তা ও অনড় পা, দু'টোই বিশ্বাসের প্রমাণ। রাসূল (সা.) বলেছেনঃ ''আমরা নবীরা (আ.) সবচেয়ে কঠিন দুঃখ- কষ্ট মোকাবিলা করি। আমাদের পর আসে বিশ্বাসীরা, এরপর তাদের মত অন্যরা।''

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নিরাপত্তায় থেকে যে দুঃখ- কষ্টের স্বাদ গ্রহণ করে সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নেয়ামত থেকেও এতে বেশী আনন্দ বোধ করে। সে এর আকাঙ্ক্ষা করে যখন তা নেই, কারণ রহমতের আলোগুলো দুঃখ- কষ্ট ও পরীক্ষার দাঁড়িপাল্লার নীচে থাকে। অনেকেই দুঃখ- কষ্ট থেকে মুক্তি এবং নেয়ামতে ধ্বংস হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার কোন বান্দাহর প্রশংসা করেন নি – আদম থেকে মুহাম্মাদ পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তাদের পরীক্ষা করেছেন এবং দেখেছেন সে কীভাবে ইবাদাতের দায়িত্ব পালন করেছে দুঃখ- কষ্টের ভেতরে থেকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সম্মানের পদক আসে একদম শেষ অবস্থায়, কিন্তু দুঃখ- কষ্ট আসে একদম শুরুতে।

যে দুঃখ- কষ্টের পথ ছেড়ে দেয় সে অস্বীকার করে বিশ্বাসীদের প্রদীপকে, যারা আল্লাহর নিকটবর্তী তাদের আলোর মিনারকে এবং যারা সঠিক পথে আছে তাদের পথপ্রদর্শককে। কোন বান্দাহর ভেতরে ভালো কিছু নেই যদি সে একটি পরীক্ষার জন্য অভিযোগ করে অথচ যার আগে এসেছে হাজার হাজার নেয়ামত এবং যার পরে আসবে হাজার হাজার আরাম। যে দুঃখ- কষ্টের ভেতর ধৈর্য ধরে না সে নেয়ামতগুলো গ্রহণের পর কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন থেকে বঞ্চিত হয়। একইভাবে যে নেয়ামতগুলোর কারণে দায়বদ্ধ অথচ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে না সে দুঃখ- কষ্টে ধৈর্য ধরা থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়। যে এ দু'টোতেই প্রত্যাখ্যাত হয় সে বিতাড়িত।

আইউব তার দোয়ায় বলেছিলোঃ ''হে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা, নিশ্চয়ই সত্তরটি দুঃখ-কষ্ট আমার কাছে এসেছে যখন আমাকে আপনি সত্তরটি আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য পাঠিয়েছেন।''

ওয়াহাব ইবনে মুনাবিবহ বলেছেঃ ''বিশ্বাসীর দুঃখ- কষ্ট হলো ঘোড়ার মুখের দড়ি এবং উটের নাকের দড়ি।'' আলী (আ.) বলেছেনঃ ''দৃঢ়তার সাথে ঈমানের সম্পর্ক হলো দেহের সাথে মাথার সম্পর্কের মত। দৃঢ়তার মাথা হলো দুঃখ- কষ্ট, কিন্তু শুধু তারা তা বোঝে যারা সৎ কাজ করে।''

ধৈর্য

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বান্দাহদের গীভরতম সত্তায় যে আলো ও পবিত্রতা রয়েছে, ধৈর্য তাকে প্রকাশ করে দেয় এবং তাদের ভেতরে যে অন্ধকার ও শূন্যতা আছে, দুঃশ্চিন্তা তাকে প্রকাশ করে দেয়। প্রত্যেকেই ধৈর্যশীল হওয়ার দাবী করে কিন্তু শুধু বিনয়ীরা এতে দৃঢ়। প্রত্যেকেই দুঃশ্চিন্তা অস্বীকার করে অথচ তা একজন মোনাফেক্ব এর ভেতরে স্পষ্ট। কারণ পরীক্ষা ও দুঃখ- কষ্টের শুরুই তোমাকে বলে দেয় কে সত্যবাদী ও কে মিথ্যাবাদী।

ধৈর্য হচ্ছে একটি অনুভূতি যা সার্বক্ষণিকভাবে ব্যক্তির বিবেকে বজায় থাকে কিন্তু হঠাৎ কোন বিপর্যয়ে যা ঘটে তাকে ধৈর্য বলা যায় না। দুঃশ্চিন্তা হলো তা যা মানুষের অন্তরকে বিচলিত করে এবং ব্যক্তির জন্য দুঃখ আনে, তার রং ও অবস্থা পরিবর্তন করে দেয়। প্রত্যেক বিষয় যার আরম্ভ নম্রতা, অনুতাপ এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে বিনয়পূর্ণ দোয়া ছাড়া – তা আসে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ ব্যক্তির কাছ থেকে, ধৈর্যশীলের কাছ থেকে নয়। ধৈর্যের শুরুটি তিক্ত কিন্তু এর শেষ কিছু লোকের জন্য মিষ্টি; কিন্তু অন্যদের জন্য এর শুরু ও শেষ দু'টোই তিক্ত। যে এতে এর শেষে প্রবেশ করেছে সে এতে প্রবেশ করেছে। যে এর শুরুতে প্রবেশ করেছে সে তা ছেড়ে এসেছে। যে ব্যক্তি ধৈর্যের মূল্য জানে সে এছাড়া থাকতে পারে না।

মূসা এবং খিযির (আ.)- এর ঘটনায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا)

''তুমি কীভাবে তাতে ধৈর্য ধরবে যার বিষয়ে তোমার সম্পূর্ণ জানা নেই?'' (সূরা কাহফঃ ৬৮)

যে অনিচ্ছায় ধৈর্য ধরেছে, যে অন্যদের কাছে অভিযোগ করে না এবং যখন তার পর্দা ছিঁড়ে যায় দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয় না, সে সাধারণ লোকদের অন্তর্ভূক্ত। তার অংশ রয়েছে যেরকম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ)

''সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের।'' (সূরা বাকারাঃ ১৫৫)

আর তা হচ্ছে জান্নাত ও ক্ষমার সুসংবাদ। যে দুঃখ- কষ্টকে খোলা অন্তরে গ্রহণ করেছে এবং ধৈর্য ধরেছে শান্ত অবস্থা ও মর্যাদা বজায় রেখে সে উচ্চ স্থানীয়দের অন্তর্ভূক্ত এবং তার অংশ হলো যেরকম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)

''নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।'' (সূরা আনফালঃ ৪৬)

দুঃখ

দুঃখ হলো আধ্যাত্মিক লোকদের চিহ্ন, যখন তারা নির্জনে থাকে তখন অদৃশ্য থেকে তাদের কাছে তা আসে তার ব্যাপকতার মাঝ দিয়ে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রশংসার তীব্রতার মাঝ দিয়ে। দুঃখ ভারাক্রান্তের বাইরের সত্তা হলো সংকোচন এবং তার ভেতরের সত্তা হলো প্রসারণ।

সে লোকজনের সাথে বসবাস করে সন্তুষ্টির সাথে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নিকটবর্তী জীবন নিয়ে। দুঃখী ব্যক্তি গভীরভাবে ভাবে না, কারণ যে গভীরভাবে ভাবে সে তা করতে বাধ্য হয় কিন্তু দুঃখী ব্যক্তি প্রকৃতিগতভাবেই সেরকম। দুঃখ আসে ভেতর থেকে এবং ভাবনা আসে ঘটনা দেখে। এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য আছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইয়াকুবের ঘটনায় বলেছেনঃ

(إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)

‘‘আমি শুধু আমার শোক ও দুঃখের অভিযোগ করি আল্লাহর কাছে এবং আমি আল্লাহর কাছ থেকে জানি যা তোমরা তা জানো না।’’ (সূরা ইউসুফঃ ৮৬)

এর কারণ হলো দুঃখের অবস্থায় যে জ্ঞান অর্জিত হয় তা শুধু তারই জন্য এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এর জন্য তাকে বাছাই করেছেন এবং পৃথিবীর বাকী সবাইকে তা থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। যখন রাবি ইবনে কুসাইমকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো কেন সে দুঃখ ভারাক্রান্ত, সে বলেছিলোঃ ‘‘কারণ আমি আমার কাছে কিছু দাবী করেছি।’’ দুঃখের ডান দিকে দাঁড়ায় সংকোচন এবং এর বাম দিকে দাঁড়ায় নিরবতা। দুঃখ হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আরেফদের একটি চিহ্ন।

গভীর ভাবনা উচ্চস্থানীয় এবং সাধারণ মানুষ উভয়ই করে। যদি আরেফদের অন্তর থেকে দুঃখকে এক ঘন্টার জন্য পর্দার আড়াল করে দেয়া হয় তাহলে তারা এর জন্য সাহায্য চাইবে কিন্তু তা যদি অন্যদের অন্তরে স্থাপন করা হয় তারা তা অপছন্দ করবে। দুঃখ হলো প্রথম আর এরপরে আসে নিরাপত্তা ও সুসংবাদ। ঈমান আনার পর এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে আশ্রয় চাওয়ার মাধ্যমে তাঁর প্রয়োজন উচ্চারণ করার পর আসে গভীর ভাবনা। দুঃখ ভারাক্রান্ত ব্যক্তি গভীরভাবে ভাবে এবং যে গভীরভাবে ভাবে সে শিক্ষা গ্রহণ করে। তাদের প্রত্যেকের আছে একটি অবস্থা, একটি বিজ্ঞান, একটি পথ, সহনশীলতা ও সম্মান।

মধ্যপন্থা

মধ্যপন্থা হলো একটি আলো যার সারাংশ হলো বিশ্বাসের প্রাণকেন্দ্র, এর অর্থ হলো সে সব কিছুর সতর্কপূর্ণ বিবেচনা যেগুলোকে তাওহীদ ও ইরফান (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) নিন্দা করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ''মধ্যপন্থা হলো বিশ্বাসের অংশ।'' মধ্যপন্থা গ্রহণ করা হয় বিশ্বাসের মাধ্যমে এবং বিশ্বাসগুলো গ্রহণ করা হয় মধ্যপন্থার মাধ্যমে। মধ্যপন্থী ব্যক্তির সব ভালো। যাকে মধ্যপন্থা দেয়া হয় নি তার সব খারাপ, যদি সে ইবাদাত করে ও সাবধানী হয় তবুও।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভয়ের উঠোনে মধ্যপন্থায় এক কদম ফেলা সত্তর বছর ইবাদাতের চাইতে উত্তম। অন্যদিকে ঔদ্ধত্য হলো মোনাফেকী, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের শুরু।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ''যদি তোমার কোন লজ্জা না থাকে তাহলে যা ইচ্ছা কর।'' এর অর্থ হচ্ছে যখন মধ্যপন্থা তোমাকে ছেড়ে যায় তখন তোমাকে শাস্তি দেয়া হবে সব ভালো অথবা খারাপ কাজের জন্য যা তুমি কর। মধ্যপন্থার শক্তি আসে দুঃখ ও ভয় থেকে এবং মধ্যপন্থা হলো ভয়ের বাসা। মধ্যপন্থার শুরু হচ্ছে ভয় এবং এর শেষ হচ্ছে স্বচ্ছ দৃষ্টি। একজন মধ্যপন্থী ব্যক্তি নিজের বিষয়গুলো নিয়ে ব্যস্ত, লোকজনের কাছ থেকে দূরে এবং তারা যা করে তা থেকে দূরে। যদি তারা সবাই এ মধ্যপন্থী লোকটিকে পরিত্যাগ করে তবুও।

রাসূলূল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ''যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা একজন বান্দাহর জন্য ভালো চান, তিনি তাকে তার ভালোগুণগুলো সম্পর্কে ভুলিয়ে দেন, তার খারাপ গুণগুলো তার চোখের সামনে তুলে ধরেন এবং যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার স্মরণ করে না তাদের সাথে বসাকে তার কাছে অপছন্দনীয় করে দেন।''

মধ্যপন্থা পাঁচ প্রকারেরঃ ভুল কাজের জন্য লজ্জা, অক্ষমতার জন্য লজ্জা, সম্মানিত সমসাময়িকের সামনে মধ্যপন্থা, ভালোবাসার মধ্যপন্থা, এবং ভয়ের মধ্যপন্থা। এদের প্রত্যেকটিরই অনুসারী আছে যাদেরকে মধ্যপন্থার এ বিভিন্ন শ্রেণীতে মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

মারেফাহ

একজন আরেফ (যার মারেফাহ আছে) থাকে মানুষের সাথে কিন্তু তার অন্তর থাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে। যদি তার অন্তর চোখের এক পলকের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে ভুলে যায় তাহলে সে তাঁর টানে মারা যাবে। আরেফ হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ঘটনাগুলোর আমানত রক্ষাকারী, তাঁর গোপন রহস্যের ভান্ডার, তার নূরসমূহের সিন্দুক, তাঁর সৃষ্টিকূলের প্রতি তাঁর রহমতের প্রমাণ, তাঁর বিজ্ঞানগুলোর হাতিয়ার এবং তাঁর নেয়ামত ও ন্যায়বিচারের পরিমাপ। সে লোকজনের কোন প্রয়োজন অনুভব করে না, না কোন লক্ষ্যের, আর না এ পৃথিবীর। তার ঘনিষ্ট কেউ নেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ছাড়া। না আছে কোন বক্তব্য, না কোন ইশারা অথবা শ্বাস একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার মাধ্যমে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কাছ থেকে ছাড়া, কারণ সে তাঁর পবিত্রতার বাগানে আসা যাওয়া করছে এবং সে তাঁর সবচেয়ে সূক্ষ্ণ সহানুভূতিতে সমৃদ্ধ। মারেফাহ হচ্ছে শিকড় যার শাখা হচ্ছে বিশ্বাস।

আল্লাহর ভালোবাসা

যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভালোবাসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বান্দাহর গভীরতম সত্তায় স্থান করে নেয় তখন তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার স্মরণ ছাড়া আর সব চিন্তাকে বের করে দেয়। সব মানুষের মধ্যে আল্লাহ প্রেমিকই সত্তার ভেতরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য সবচেয়ে মোখলেস (আন্তরিক)।

সে তার কথায় সবচেয়ে সত্যবাদী, প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সবচেয়ে বিশ্বস্ত, কাজকর্মে সবচেয়ে বুদ্ধিমান, যিকর-এ সবচেয়ে বিশুদ্ধ এবং ইবাদাতে তার নিজ সত্তাকে নিয়োজিত করায় শ্রেষ্ঠতম।

ফেরেশতারা পরস্পর প্রতিযোগিতা করে তার সাথে কথা বলার জন্য এবং তাকে দেখেছে বলে গর্ব করে বেড়ায়। তার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর ভূমিকে সমৃদ্ধি দেন এবং তার সম্মানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর বান্দাহদের সম্মানিত করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা জনগণকে দান করেন যখন তারা তাঁর কাছে চায় এই ব্যক্তির অধিকারের মাধ্যমে এবং তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেন তাঁর রহমতের মাধ্যমে। যদি জনগণ জানতো তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে কী সম্মানপ্রাপ্ত তাহলে তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নিকবর্তী হতে চাইতো না তাদের পায়ের ধূলোর মাধ্যমে ছাড়া।

আমিরুল মুমিনীন বলেছেনঃ ‘‘আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভালোবাসা হলো একটি আগুন যা কোন কিছুর পাশ দিয়ে যায় না তাকে পুড়িয়ে না ফেলে – আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নূর কোন কিছুর ওপর হাজির হয় না একে আলোকিত না করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আকাশগুলো কোন মেঘ সৃষ্টি করে না এর নীচে যা আছে তাকে না ঢেকে; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বাতাস কোন কিছুর উপর প্রবাহিত হয় তাকে না নাড়িয়ে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পানি সবকিছুকে জীবন দেয় এবং আল্লাহ সুবহানাহু

ওয়া তায়ালার পৃথিবীর মাটি থেকে সবকিছু জন্মায়। যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে ভালোবাসে তাকে সব সম্পদ এবং ক্ষমতা দেয়া হয়।''

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ''যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমার উম্মতের ভেতর কোন বান্দাহকে ভালোবাসেন, তিনি তার ভালোবাসাকে স্থাপন করেন তাঁর বন্ধুদের অন্তরে, ফেরেশতাদের ও তাঁর আরশ বহনকারীদের রুহের ভেতরে যেন তারা তাকে ভালোবাসে। এ প্রেমিকের আছে অঢেল প্রশান্তি এবং কেয়ামতের দিনে সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে সুপারিশ করতে পারবে।''

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য ভালোবাসা

যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য ভালোবাসে সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভালোবাসার পাত্র এবং যাকে ভালোবাসা হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কারণে সেও আল্লাহর ভালোবাসার পাত্র। যেহেতু তারা পরস্পরকে ভালোবাসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কারণে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ''মানুষ যাকে ভালোবাসে সে তার সাথেই থাকে। যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পথে কোন বান্দাহকে ভালোবাসে সে আল্লাহকে ভালোবাসে। কেউ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে ভালোবাসে না সে ছাড়া যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ভালোবাসেন।'' আরও বলেছেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর পর মানুষের মাঝে তারাই এ পৃথিবীতে ও আখেরাতে উত্তম যারা পরস্পরকে ভালোবাসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কারণে।' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ছাড়া অন্য কোন কারণের উপর ভিত্তি করে যে ভালোবাসা আসে তা শত্রুতা আনে – শুধু এ দু'টো ছাড়া, কারণ তারা আসে একই উৎস থেকে। এদের ভালোবাসা সবসময় বৃদ্ধি পায় এবং কখনও কমে না। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ)

''বন্ধুরা সেদিন পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে শুধু তারা ছাড়া যারা (অন্যায়ের বিরুদ্ধে) সতর্ক পাহারা দেয়।'' (সূরা যুখরুফঃ ৬৭)

কারণ ভালোবাসার শিকড় হলো সবকিছু থেকে মুক্ত হওয়া একমাত্র মাহবুব (যাকে ভালোবাসা হয়) ছাড়া।

আমিরুল মুমিনীন বলেছেনঃ ''জান্নাতে সবচেয়ে ভালো ও সবচেয়ে যা মিষ্টি- মধুর তা হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভালোবাসা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাতে ভালোবাসা এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রশংসা। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন : তাদের শেষ দোয়া হবেঃ

(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)

''সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।'' (সূরা ইউনুসঃ ১০)

কারণ যখন তারা জান্নাতের নেয়ামতগুলো দেখে তখন তাদের ভেতরে ভালোবাসা জেগে ওঠে এবং তখন তারা শব্দ করে বলে ওঠেঃ ''সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।''

আল্লাহকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা

যে আকাঙ্ক্ষা করে সে না চায় খাবার, না পায় পানি পানে কোন তৃপ্তি, না সে সহজে উত্তেজিত হয়, না সে কারো ঘনিষ্ঠ এমনকি তার নিকট বন্ধুদের সাথেও না, না সে আশ্রয় খোঁজে কোন বাড়িতে, না সে বাস করে কোন শহরে, না সে কোন পোষাক পরে এবং না সে তার প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট বিশ্রাম নেয়।

সে রাত দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ইবাদাত করে, তার আকাঙ্ক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর আশায়। সে তাঁর সাথে কথা বলে আকাঙ্ক্ষার জিহবা দিয়ে – তার গভীরতম সত্তায় যা আছে তা প্রকাশ করে। মূসা (আ.) সম্পর্কে এটিই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন যখন সে তার রবের মোলাকাতে গেলোঃ

(قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ)

''আমি আপনার কাছে দ্রুত আসছি হে আমার রব, যেন আপনি সন্তুষ্ট হন।'' (সূরা ত্বোয়া- হাঃ ৮৪)

রাসূলুল্লাহ (সা.) তার অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ ''সে না খেত, না পান করতো, না ঘুমাতো, না সে এর কোন কিছু চেয়েছে চল্লিশ দিন ধরে আসা ও যাওয়াতে – তার রবের প্রতি তার আকাঙ্ক্ষার কারণে।''

যখন তুমি আকাঙ্ক্ষার এলাকায় প্রবেশ কর তখন তাকবীর বলো তোমার জন্য এবং এ পৃথিবীতে তোমার আশা আকাঙ্ক্ষাগুলোর জন্য। বিদায় জানিয়ে দাও সব পরিচিত জিনিসকে এবং সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও শুধু তিনি ছাড়া যাকে তুমি সবচেয়ে বেশী চাও। 'লাববায়েক' (আপনার খেদমতে হাজির) শব্দটি বলো তোমার জীবন ও মৃত্যুর মাঝে : ''তোমার খেদমতে হে আল্লাহ, তোমার খেদমতে!' তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তোমার পুরস্কারকে করবেন মহান। যে ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করে সে ডুবন্ত মানুষের মত, তার চিন্তা শুধু রক্ষা পাওয়া এবং ভুলে যায় বাকী সবকিছু।

পরিচ্ছেদ- ২৪

প্রজ্ঞা

প্রজ্ঞা হচ্ছে মারেফাতের নূর, ভয়পূর্ণ সচেতনতার মাত্রা এবং সত্যবাদিতার ফল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর কোন বান্দাহকে তার অন্তরের জন্য প্রজ্ঞার চাইতে মহান, এর চাইতে পছন্দনীয়, উদার, উচ্চ স্থানীয় অথবা সুন্দর নেয়ামত আর দেন নি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কথায়ঃ

(يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ)

''তিনি প্রজ্ঞা দান করেন যাকে তাঁর ইচ্ছা এবং যাকে প্রজ্ঞা দেয়া হয়, তাহলে অবশ্যই তাকে দেয়া হয়েছে এক বিরাট ভালো জিনিস এবং বুঝদার মানুষ ছাড়া কেউ বোঝে না।'' (সূরা বাকারাঃ ২৬৯)

এর অর্থ- 'শুধু যাকে আমি বাছাই করেছি আমার জন্য এবং যাকে আমি নির্ধারণ করেছি এর জন্য, কেবল সেই জানে কী প্রজ্ঞা আমি সংরক্ষণ ও প্রস্তুত করেছি।''

প্রজ্ঞা হচ্ছে উদ্ধার, বিষয়ের শুরুতে স্থিরতা এবং শেষে দৃঢ় ভূমিকা। এটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বান্দাহর ভেতর তাঁর প্রতি উচ্চাশা সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) আলীকে (আ.) বলেছেনঃ ''যদি তোমার হাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর কোন বান্দাহকে পথ দেখান তা তোমার জন্য সে সব জিনিসের চাইতে উত্তম যাদের উপরে সূর্য আলো দেয় পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত।''

দাবী করা

বাস্তবে দাবী করা শুধু রাসূলুল্লাহ (সা.), ইমামদের (আ.) এবং সত্যবাদিদের অধিকার এবং যে ব্যক্তি অযৌক্তিকভাবে দাবী করে সে অভিশপ্ত ইবলিস- এর মত। সে ধার্মিকতার দাবী করে অথচ বাস্তবে সে আল্লাহর সাথে (অন্তরে) তর্ক করে এবং তাঁর আদেশের বিরোধিতা করে। যে এ ধরনের দাবী করে সে তার মিথ্যাকে প্রকাশ করে এবং মিথ্যাবাদীকে বিশ্বাস করা যায় না। যে কোন কিছু দাবী করে যা তার জন্য বৈধ নয় সে তার নিজের জন্য দুঃখ- দুর্দশার দরজা খুললো। যে কেউ

কোন কিছুর দাবী করে তাকে সন্দেহাতীতভাবে জিজ্ঞাসা করা হবে স্পষ্ট প্রমাণের জন্য, যার মাধ্যমে দেখানো হবে যে, সে দেউলিয়া ও অপমানিত। সত্যবাদী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয় না তার কাজের কারণ সম্পর্কে। যেমন আলী (আ.) বলেছেনঃ ‘‘কোন ব্যক্তি একজন সত্যবাদী লোকের প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টি ছাড়া তাকায় না।’’

কথা গ্রাহ্য করা

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ‘‘যে এ পৃথিবীতে তার শিক্ষা গ্রহণ করে সে এতে বাস করে ঘুমন্ত ব্যক্তির মত : সে একে দেখে কিন্তু একে স্পর্শ করে না। তার অন্তরে ও সত্তায় ঘৃণা বৃদ্ধি পেতে থাকে তাদের আচরণে যারা এ পৃথিবীর মাধ্যমে প্রতারিত হয়েছে – যা শুধু আনবে হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি। সে এ পৃথিবীকে তার সাথে বদল করে নেয় যা তাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টির কাছে নিবে ও ক্ষমা এনে দিবে। সে নিজেকে ধুয়ে ফেলে সেগুলো থেকে যেদিকে এ পৃথিবী তাকে আমন্ত্রণ করে এবং এর জাগতিক অলংকার থেকে – এ পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হওয়ার পানি দিয়ে।

যে ব্যক্তি কথা গ্রাহ্য করে তার জন্য তা তিনটি জিনিস এনে দেয় : সে যা করে তার জ্ঞান, সে যা জানে সে অনুযায়ী কাজ এবং যা সে জানে না সে সম্পর্কে জ্ঞান। কথা গ্রাহ্য করার শিকড় নিহিত আছে এর ফলাফল সম্পর্কে ব্যক্তির ভীতিতে, যখন সে দেখে যে সে শুরুতে এ থেকে পূর্ণ বিরত থেকেছে। কথা গ্রাহ্য করা শুধু তাদের জন্যই সফল যাদের পবিত্রতা ও অর্ন্তদৃষ্টি আছে । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ)

‘‘শিক্ষা নাও, হে যাদের দৃষ্টি আছে’’ (সূরা হাশরঃ ২)

আরও বলেছেনঃ

(فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ)

‘‘কারণ নিশ্চয়ই চোখগুলো অন্ধ নয়, কিন্তু অন্ধ হচ্ছে তাদের অন্তর যা আছে বুকের ভেতরে।’’ (সূরা হাজ্জঃ ৪৬)

যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বিবেচনার মাধ্যমে কারো অন্তরের চোখ এবং অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেন, তাহলে তিনি তাকে দিয়েছেন এক উচ্চ মাক্বাম ও বিশাল সৌভাগ্য।

সন্তুষ্টি

যদি সন্তুষ্ট কোন ব্যক্তি শপথ করে বলে যে সে তার দুই জগতের বাসস্থানের দায়িত্বে থাকবে তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে সে বিষয়ে সত্যায়ন করবেন তার সন্তুষ্টির ব্যাপকতার মাধ্যমে তার আশাকে বাস্তবায়ন করে ।

কীভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বান্দাহ সন্তুষ্ট না হতে পারে সেসব নিয়ে যা তিনি তার জন্য নির্ধারণ করেছেন? যখন তিনি বলেছেনঃ

(نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)

‘‘আমরা তাদের মধ্যে জীবন উপকরণ বন্টন করি এ পৃথিবীর জীবনে।’’ (সূরা যুখরুফঃ ৩২)

যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি প্রাণ খুলে দেয় এবং তিনি যা চান এবং যখন চান সে বিষয়ে তাকে সত্যায়ন করাতে উদাসীন থাকে না এবং যে তাঁর রুবুবিয়্যাত (প্রতিপালকত্ব) সম্পর্কে ইয়াক্বীন রাখে, সে ‘প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনোপকরণ নির্ধারিত মাত্রায় বন্টন- এর দায়িত্ব সরাসরি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার হাতে’ বলে স্বীকৃতি দেয় এবং বস্তুগত কারণগুলোকে স্বীকার করে না। যা দেয়া হয়েছে তা নিয়ে সে সন্তুষ্ট থাকে এবং সে চিন্তা, দুঃখ ও ক্লান্তি থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যখন সে সন্তুষ্টিতে কমে যায়, তখন সে কামনা- বাসনায় বৃদ্ধি পায়। এ পৃথিবীর জন্য লোভ সব খারাপের শিকড়; যার এটি আছে সে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত নয় যদি না সে তওবা করে।

তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ‘‘সন্তুষ্টি একটি রাজ্য যা নিঃশেষ হয়ে যায় না।’’ এটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টির জাহাজ, যে এতে আরোহণ করেছে এটি তাকে তাঁর বাড়িতে

নিয়ে যায়। যা তোমাকে দেয়া হয় নি তাতে উচ্চ আস্থা রাখো এবং যা তোমাকে দেয়া হয়েছে তাতে আনন্দিত হও। ধৈর্য ধরো তোমার মুসিবতে, কারণ নিশ্চয়ই তা সবচেয়ে বড় কাজ।

অপবাদ

সব মুসলিমের জন্য অপবাদ নিষিদ্ধ এবং যে অপবাদ দেয় সে প্রত্যেকবারই গুনাহ করে । অপবাদ হলো যখন তুমি কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বল যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দৃষ্টিতে কোন ত্রুটি নয় অথবা যখন তুমি তিরস্কার কর যা জ্ঞানী ব্যক্তিরা প্রশংসা করে।

যে ব্যক্তি উপস্থিত নেই তার সাথে সম্পর্কিত কোন বিষয়ে যদি আলোচনা করা হয় যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তিরস্কার করেছেন, যখন সে ব্যক্তি এ বিষয়ে অপরাধী তখন তা অপবাদ নয়, যদি সে শোনার পর তা অপছন্দ করে তবুও; তাহলে তুমি সে ব্যক্তিকে ছোট করা থেকে মুক্ত। এটি এজন্য বলা হলো যেন সত্য মিথ্যা থেকে আলাদা হয়ে যায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে। তবে এর একটি পূর্বশর্ত আছে। তাহলো যে ব্যক্তি তা বলে সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ধর্মে কোনটি সত্য ও কোনটি মিথ্যা খোঁজার জন্য বলবে। যদি সে ঐ ব্যক্তির বিরোধিতার জন্যই শুধু বলে এবং বিষয়কে স্পষ্ট করার জন্য না বলে তাহলে তার অসৎ উদ্দ্যেশ্যের জন্য তাকে শাস্তি দেয়া হবে, এমনও যদি হয় সে যা বলেছে তা সঠিক।

যদি তুমি সত্যিই কাউকে অপবাদ দিয়ে থাকো তাহলে তার কাছে ক্ষমা চাও। যদি তুমি ততটুকু না যাও অথবা সে পর্যায়ে না পৌঁছাও তাহলে সে জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে ক্ষমা চাও। অপবাদ ভালো কাজকে খেয়ে ফেলে যেভাবে আগুন খেয়ে ফেলে কাঠকে। যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মূসাকে ওহী করেছিলেনঃ ‘‘অপবাদদানকারী হবে জান্নাতে প্রবেশের বেলায় সর্বশেষ ব্যক্তি, যদি সে তওবা করে। যদি সে তওবা না করে তাহলে সে আগুনে প্রবেশ করবে সর্বপ্রথম।’’ যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ

(أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ)

‘‘তোমাদের মধ্যে কেউ কি পছন্দ কর তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে? তোমরা তা ঘৃণা করবে।’’ (সূরা হুজুরাতঃ ১২)

অপবাদের বিভিন্ন ধরণ ঘটে যখন তুমি কোন ব্যক্তির চরিত্র, বুদ্ধি, কাজ, ব্যবহার, বিশ্বাস, অজ্ঞতা এবং এ ধরনের আরও কিছু সম্পর্কে উল্লেখ কর।

অপবাদের উৎস হতে পারে দশটির কোন একটি : রাগ প্রকাশ করা, অন্য লোকদের খুশী করা, সন্দেহ, যাচাই- বাছাই ছাড়াই কোন সংবাদে বিশ্বাস করা, খারাপ ধারণা রাখা, ঈর্ষা, তাচ্ছিল্য করা, কারো মধ্যে কোন কাজে আশ্চর্য হওয়া যা সম্পর্কে তার পূরো বুঝ নেই, অসন্তুষ্টি অথবা অন্যদের বিষয়ে অধৈর্য এবং অন্যের ক্ষতির মাধ্যমে নিজেকে অলংকৃত করা।

যদি তুমি ইসলাম চাও তাহলে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করো, সৃষ্টিকে নয়, তখন অপবাদের পরিবেশ পরিস্থিতি তোমার জন্য একটি শিক্ষা হবে এবং একটি ভুল কাজের বদলে একটি পুরষ্কার দেয়া হবে।

সূচিপত্র :

দাসত্ব (উবুদিয়্যাহ) 7

জ্ঞানের বিষয়ে 12

ভালোর আদেশ করা ও খারাপকে নিষেধ করা 15

কীভাবে জ্ঞানী ব্যক্তিরা ধ্বংস হয় 17

নিজেকে পাহারা দেয়া (রিয়াইয়াহ) 19

পোষাক 25

লোক দেখানো (রিয়া) 27

সত্যবাদিতা 28

ইখলাস (বিশুদ্ধ আন্তরিকতা) 30

তাক্বওয়া (সতর্কতা) 32

আল্লাহ ভীতি 34

হজ্ব 38

যাকাত 41

নিয়ত 43

যিকর 44

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আধ্যাত্মিক জ্ঞান (ইরফান) 49

সাহাবীদের স্বীকৃতি দান 54

বিশ্বাসীদের সম্মান ও মর্যাদা 56

পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন 57
বিনয়. 59
শয়তানী কুমন্ত্রণা (ওয়াসওয়াসা) 63
গর্ব 65
উদারতা. 66
নিজের হিসাব নেয়া 68
নামাজের দরজা খোলা. 70
তওবা 77
নিজেকে গুটিয়ে নেয়া (উযলাহ) 79
ঈর্ষা. 82
কলুষতা 84
ইবাদাত 87
গভীর ভাবনা 89
সম্পদের লোভ. 92
সত্য-মিথ্যার স্পষ্ট প্রকাশ. 94
পবিত্রতা অর্জন. 99
রোযা রাখা. 104
বিরত থাকা 106

কাজ করায় অনীহা.............................108
মোনাফিক্বদের বর্ণনা.............................111
ভ্রাতৃত্ববোধ.............................114
পরামর্শ.............................116
সহনশীলতা.............................118
অন্যদের উদাহরণ অনুসরণ করা.............................120
ক্ষমা.............................122
সতর্ক করা.............................124
ভাইদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন.............................129
সংগ্রাম ও শৃঙ্খলা.............................131
মৃত্যু নিয়ে ভাবা.............................133
ভালো ধারণা.............................135
নিজেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে সমর্পন করা.............................136
ইয়াক্বীন (যে বিশ্বাস নিশ্চয়তায় পৌঁছেছে).............................138
ভয় ও আশা.............................140
দুঃখ-কষ্ট.............................142
মধ্যপন্থা.............................146
আল্লাহর ভালোবাসা.............................148

আল্লাহকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা.................................151